ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প

লীলা মজুমদার

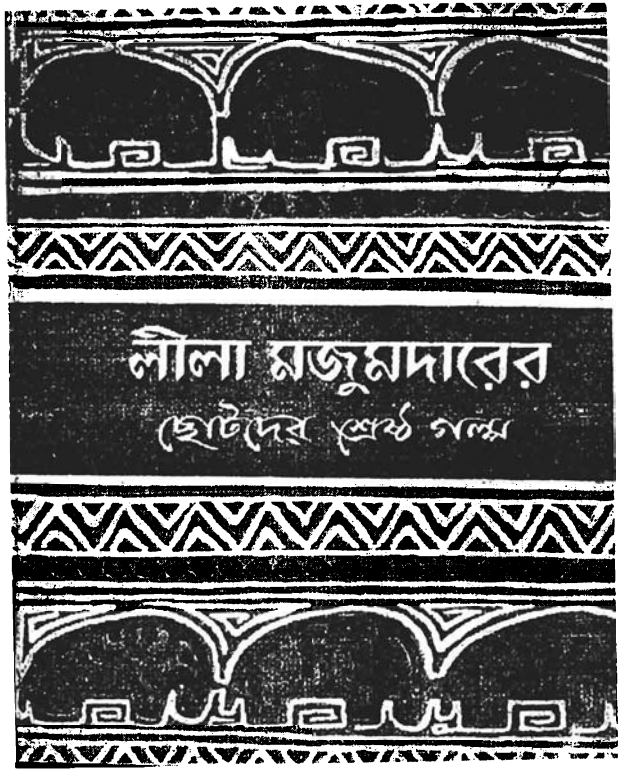
লীলা মজুমদারের
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প

খাগায় নমঃ

ছোটোবেলায় এই দোল-টোলের সময় যখন দেশে যেতাম, আমার ছোটঠাকুরদা আমাদের রাজ্যের গাঁজাখুরি গল্প বলতেন, সেসব একবার শুনলে আর ভোলা যায় না। একদিন বললেন, 'দেখ, এই যে আমাদের গুষ্টির ধনদৌলত দেখে গাঁসুদ্ধু লোকের চোখ টাটায়, এ কি আর একদিনে হয়েছিল ভেবেছিস, না কি চিরকাল এমনটি ছিল? বুঝলি, এসব লেখাপড়া শিখে, সারাজীবন খেটেখুটেও কেউ করে দিয়ে যায়নি, বা লটারিও জেতেনি। কি শ্বশুরের কাছ থেকেও পায়নি। মাটি খুঁড়তে খুঁড়তেও কেউ ঘড়া ঘড়া সোনা পায়নি, চুরিও করেনি, ডাকাতিও করেনি। তবে হল কী করে? আরে, ওসব করে কি আর সত্যি সত্যি ভাগ্য ফেরে? এই আমাকেই দেখ-না, তিন-তিনটি বার ম্যাট্রিক ফেল করে সেই নাগাদ দিব্যি বাড়িতে বসে আছি। কিন্তু তাই বলে কি আর আমি তোদের কারু চাইতে মন্দ, না কি তোদের চাইতে কম খাই? তোরাই বল-না। এই দেখ, এ-রকম হিরের আংটি দেখেছিস কখনো? এটার দাম কম-সে-কম একটি হাজার টাকা। কখনো ভেবেছিস এত সব হল কোত্থেকে? এই যে দু-বেলা তাল তাল মাছ-মাংস দই-ক্ষীর তোরা পাঁচজনা ওড়াচ্ছিস তাই-বা আসে কোত্থেকে? জানিস, এ সমস্তরই একমাত্র কারণ হল গিয়ে একটা এই এত বড়ো কালো পালক।'

শুনে আমরা তো হাঁ! ছোটঠাকুরদা আরও বললেন,

'হ্যাঁ, একটা কালো পালক ছাড়া আর কিছু নয়। ওটিকে তোরা না দেখে থাকতে পারিস, কীই-বা দেখেছিস দুনিয়াতে, ভূত পর্যন্ত দেখিসনি। তবে ওটি কপ্পুর-টপ্পুর দিয়ে লাল শালুতে মোড়া হয়ে একটা চন্দন কাঠের বাক্সে করে আমার ঠাকুমার লোহার সিন্দুকে পোরা আছে।

'তোদের মতো আকাট মুখ্যুদের কীই-বা বলব, তবে শোন ব্যাপারটা গোড়া থেকে। আমার ঠাকুরদা ভারি চালাকচতুর কায়দাদুরস্ত মানুষ ছিলেন। ক্যায়সা তাঁর চুলের টেরি বাগাবার ঢঙ, ক্যায়সা কোঁচানো মলমলি ধুতি, গিলেকরা পাঞ্জাবি, কানের পিছনে তুলোর পুঁটলি করে আতর গোঁজা। সেসব একবার দেখলেই লোকের তাক লেগে যেত। তার উপর আবার লোককে খুশি করতে তাঁর জোড়া খুঁজে পাওয়া দায় ছিল। বুঝতেই পারছিস এইসব কারণে এখানকার যিনি রাজা ছিলেন তাঁর সঙ্গে ঠাকুরদার ভারি দহরম-মহরম ছিল। সেইজন্য রাজসভায়ও তাঁর বেজায় খাতির, আর তাই দেখে পাঁচজনার হিংসে!

'এক-এক দিন সকালে স্নান সেরে সেজেগুজে ঠাকুরদা রান্নাঘরের পাশের ওই গন্ধরাজ গাছটি— ওটির কি কম বয়স ভেবেছিস?— ওই গাছটা থেকে দুটো ফুল পেড়ে নিয়ে

রাজসভায় গিয়ে হাজির হতেন। আর সটাং গিয়ে রাজার কানে কানে কী যে না বলতেন তার ঠিকানা নেই। ব্যস, রাজাও আহ্লাদে আটখানা হয়ে হাতের কাছে যা পেতেন, শাল-দোশালা— শিরোপা, জামা, জুতো, সব তাঁকে উপহার দিয়ে বসে থাকতেন!

'এমনকী শেষটা এমনি অবস্থা দাঁড়াল যে, দূর থেকে তাঁকে সভায় ঢুকতে দেখেই সভাসদ যত উজির-নাজিররা যে-যার গয়নাগাটি, জুতো, পাগড়ি লুকিয়ে ফেলতেন। এমনি সব ছোটো মন ছিল! নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস যে, এঁরা কেউই ঠাকুরদা বেচারিকে সুনজরে দেখতেন না। সত্যি কথা বলতে কী সব্বাই তাঁর উপর হাড়ে-চটা ছিলেন, এমনকী একা পেলে তাঁকে খোশামুদে বলে অপমান করতেও ছাড়তেন না। অবিশ্যি তাতে আমার ঠাকুরদার কাঁচকলাও এসে যেত না, তিনি দিব্যি আদরে-গোবরে রাজার কাছে দিন কাটাতেন।

'এখন মুশকিল হল যে মানুষের কখনো চিরদিন একভাবে যায় না। তোরাই কি আর সারাটা জীবন ওইরকম কাজকম্ম না করে পরের ঘাড়ে দিব্যি চেপে কাটাতে পারবি ভেবেছিস? ঠাকুরদা বেচারি খাসা নিশ্চিন্তে রাজসভায় মৌরসিপাট্টা গেড়ে জেঁকে বসেছেন। রাজবাড়ি থেকে রোজ তাঁর জন্যে কলসি কলসি দুধ, ঘি, ভাঁড় ভাঁড় দই, ক্ষীর, ধামা ধামা চাল, কলা, থোক থোক নতুন গরদ, তোড়া তোড়া মোহর যায়। তাঁর আবার ভাবনা কীসের?

'এমনি সময় হঠাৎ একদিন কোত্থেকে এক ছোকরা কবি, বলা নেই কওয়া নেই, একেবারে রাজসভায় এসে হাজির! কেউ তাকে কস্মিনকালেও চোখে তো দেখেনি, নাম পর্যন্ত শোনেনি। কিন্তু যেমনি তার রূপ, তেমনি তার খোশামুদে স্বভাব; দু-দিনের মধ্যে রাজাসুদ্ধু রাজসভাকে একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে এনে ফেলল।

'কী আর বলব তোদের! তার উপর তার খাসা গানের গলা ছিল, আর কত যে ছলচাতুরি জানত! যখন-তখন যেমন-তেমন করে দুটো ছড়া গেঁথে নিয়ে গুবগুবাগুব-না বাজিয়ে, বাউলদের মতো করে এমনি নেচে-কুঁদে দিত যে সভাসুদ্ধু সব্বাই একেবারে গলে জল।

'ওদিকে ঠাকুরদা পড়ে গেলেন মুশকিলে। রাজা আর তাঁর দিকে ফিরেও তাকান না। রাজবাড়ি থেকে রসদের লাইনও বন্ধ। এমনিতেই রাজ্যের লোককে চটিয়ে রেখেছেন। আর বছরের পর বছর বসে বসে এটা-ওটা খেয়ে দারুণ কুঁড়েও হয়ে গেছেন, তায় আবার দিব্যি টইটম্বুর একটি নাহাপাতিয়াও বাগিয়েছেন। অন্য জায়গায় কাজকর্মের জন্য যে একটু চেষ্টাচরিত্তির করবেন তারও জো নেই। অথচ মনে মনে বেশ বুঝছেন যে, এবার এখানকার পাট উঠল, ওই ছোকরার সঙ্গে পেরে ওঠা, শুধু তাঁর কেন, তাঁর চোদ্দোপুরুষের কারো কম্ম নয়।

'আস্তে আস্তে ঠাকুরদার জীবন থেকে সুখশান্তি বিদায় নিল।— এই, তোরা যে বড়ো হাসছিস? নিজের অতিবৃদ্ধ-ঠাকুরদার দুর্গতির কথা শুনলে তোদের হাসি পায়? আরও শোন তবে। মানুষের অবস্থা মন্দ হলে যেমন হয়, ভোর না-হতেই— গয়লা রে, মুদি রে, তাঁতি রে, নাপিত রে, ধোপা রে, যে যেখানে ছিল সব টাকা দাও টাকা দাও করে সারি সারি হাত পেতে দাঁড়িয়ে যেতে লাগল।

'ওদিকে দিনে-দিনে অভাবে অনটনে ঠাকুমার মেজাজও এমনি খিঁচড়ে যেতে লাগল যে বাড়িতে টেঁকাও দায় হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত একদিন গভীর রাতে ঠাকুরদা বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হলেন। গভীর রাতে পা টিপে-টিপে বাড়ি থেকে-না বেরিয়ে একেবারে সটাং গিয়ে এই গ্রামের বাইরে মাঠের মাঝখানে যে বিখ্যাত ভূতুড়ে বটগাছ ছিল, দিনের বেলাতেও যার ছায়া মাড়াতে লোকে ভয় পেত— ইদিক-উদিক কি তাকাচ্ছিস বল দিকিনি? সে গাছ কোনকালে মরে ঝরে

চ্যালাকাঠ হয়ে গেছে। এখন চুপ করে শোন তো।— সেই গাছতলাতে-না গিয়ে, এক হাঁড়ি শুঁটকিমাছ নিবেদন করে দিয়ে ঠাকুরদা ধর্না দিয়ে পড়ে থাকলেন। একটা যা-হয় ব্যবস্থা না-হওয়া পর্যন্ত উঠবেন না।

'পড়ে আছেন তো পড়েই আছেন। প্যাঁচা ট্যাঁচা ডাকছে, কীসের একটা সোঁদা-সোঁদা গন্ধ নাকে আসছে, কী সব সড়সড় খড়খড় করে পায়ের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, কারা জানি চাপা গলায় ফিস-ফিস করছে, কিন্তু ঠাকুরদা নড়েনও না চড়েনও না।

'হয়তোবা একটু তন্দ্রামতো এসে থাকবে, হঠাৎ মনে হল কে যেন বলছে, ওঠ ব্যাটা, বাড়ি যা। যা যা বাড়ি যা, আর তোর কোনো চিন্তা নেই। ওঠ বলছি। কেটে পড় দিকিনি। কী জ্বালা! ভাগ বলছি!'

'ঠাকুরদাও তখনই আর কালবিলম্ব না করে, উঠে পড়ে বাড়িমুখো হাঁটা দিলেন। আর, কী আশ্চর্য ব্যাপার! একেবারে দোরগোড়ায় এসে দেখেন, পায়ের কাছে কী একটা লম্বাটে জিনিস চাঁদের আলোতে চকচক করছে। তুলে নিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে দেখেন, কুচকুচে কালো একটি পালক। তার মাঝখানে একটা চওড়া সাদা ডোরা কাটা, মুখের দিকটা একটু ছুঁচলো মতন, একটু ছেঁটে নিলেই খাসা এক খাগের কলম।

'কলমটা হাতে নিতেই হাতের আঙুলগুলো কেমন চিড়বিড় করে উঠল! ঠাকুরদা আর থাকতে না পেরে দিদিমার আলতার শিশি আর ধোপার হিসেবের খাতা নিয়ে বসে পড়লেন। আর সেই অদ্ভুত কলমটি, বিশ্বাস করিস আর নাই করিস, অনবরত কী যে সব মাথামুণ্ডু লিখে যেতে লাগল, পড়ে তো ঠাকুরদার নিজেরই চুল-দাড়ি খাড়া হয়ে উঠল।'

এই অবধি শুনে আমরা সবাই ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'কেন? চুল-দাড়ি খাড়া হবে কেন?'

'আরে, সে যে দাঁড়াল গিয়ে একটা ভূতের গল্প, যা পড়লে গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়! আমার ঠাকুরদা নিজের লেখা নিজে পড়ে প্রথমটা থ মেরে গেলেন। পরে বুঝলেন, ধর্না দেওয়ার ফল ধরেছে। সারাদিন ঘরে বসে গল্পটা মুখস্থ করে ফেললেন, তারপর সন্ধ্যা লাগতে সেজেগুজে রাজসভায় গিয়ে হাজির হলেন।

'দেখেন গিয়ে, সেই ব্যাটা হাত-পা নেড়ে দাঁত বার করে গান ধরেছে, আর লোকগুলো সব হাঁ করে তাই শুনছে আর বাহবা দিচ্ছে।

'ঠাকুরদা সভায় ঢুকতেই সঙ্গে-সঙ্গে একটা দমকা হাওয়া এসে ঝাড়লণ্ঠনটার অনেকগুলো আলো নিবিয়ে দিল। গানও তক্ষুনি থেমে গেল, সভাও থমথমে চুপচাপ হয়ে গেল। আর ঠাকুরদা রাজার সামনে এসে সিংহাসনের সিঁড়ির ধাপে বসে নীচু গলায় ভূতের গল্প শুরু করলেন। দেখতে-দেখতে সভাসদরা যে-যার আসন ছেড়ে ঠাকুরদাকে ঘিরে বসল। কবি ছোকরা তো পাঁচজনকে সরিয়ে দিয়ে সবচেয়ে কাছে এসে ঘেঁষে বসল। ঠাকুরদা অর্ধেকটা বলে থেমে গেলেন। কবি ব্যাকুল হয়ে বলল, 'তারপর?' রাজা বললেন, 'তারপর?' সভাসুদ্ধু সকলে বললে, 'তারপর?'

'গল্প শেষ করে ঠাকুরদা হাত জোড় করে বললেন, ''মহারাজ, এবার আমায় বিদায় দিন। এখানে খেতে পাইনে, ভিন-গাঁয়ে দেখি গিয়ে চেষ্টা করে।'' রাজা কিছু বলবার আগেই কবি বললে, 'না, না, সে কী! তাহলে আমাদের ভূতের গল্প কে বলবে? এই নাও আমার মনিব্যাগটা নাও।' দেখতে দেখতে সভার লোকরা ভিড় করে যে-যা পারে ঠাকুরদার হাতে গুঁজে দিতে লাগল। ঠাকুরদা সেসব চাদরে বেঁধে বাড়ি গিয়ে সকালবেলায় সব ধারটার শোধ করে দিলেন।

'তারপর আবার যেই খাগের কলমে হাত দিয়েছেন কি, আবার আঙুল চিড়বিড় করে আবার সেইরকম লেখা বেরুতে লাগল। এমনি করে ঠাকুরদা এক বছর ধরে তিন-শো পঁয়ষট্টিটা ভূতের গল্প লিখে ফেলেছিলেন। আর ঘরের মধ্যে টাকার পাহাড় জমিয়ে ফেলেছিলেন। তাই দিয়েই তো বাড়িঘর, জমিজমা, গোরু-বাছুর, খেতখামার সব হয়েছিল। তাই থেকেই তো তোরা সব দিব্যি মজা লুটছিস।'

আমরা বললাম, 'তারপর উনি থেমে গেলেন কেন? মরে গেলেন বুঝি?'

ছোটঠাকুরদা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'মোটেই মরেননি! তোরা বললেই ওঁকে মরে যেতে হবে নাকি? মরেন-টরেননি। তবে এক বছর বাদে একদিন পুরোনো পুকুরে স্নান করতে গিয়ে দেখেন এই মোটা একটা কালো পাতি হাঁস চান সেরে পাড়ে উঠে পালক সাফ করছে, আর ঠোঁটের খোঁচা খেয়ে এত বড়ো বড়ো কালো পালক এদিকে-ওদিকে পড়ে যাচ্ছে, তার প্রত্যেকটাতে একটা করে চওড়া সাদা দাগ আর মুখটা কেমন ছুঁচলো ধরনের, একটু ছেঁটে নিলেই খাসা খাগের কলম!

'তাই দেখে ঠাকুরদা ঘরে গিয়ে সিন্দুক থেকে নিজের খাগের কলমটা নিয়ে এসে মিলিয়ে দেখলেন হুবহু এক, একেবারে বেমালুম মিলে গেল! এমনি মিলে গেল যে কোনটা যে নিজের পালক তা একদম আর চেনাই গেল না! এক ফোঁটা লাল আলতাও তাতে লেগে ছিল না। রোজ তাকে এত যত্ন করে পরিষ্কার করা হত।

'ব্যস গল্প লেখা বন্ধ হল, ঠাকুরদাও পেনসিল নিলেন। কিন্তু তদ্দিনে তাঁর অবস্থাও ফিরে গেছে, চিন্তাও ঘুচে গেছে। শেষ বয়সটা দিব্যি আরামেই কাটল। ওই গল্পগুলোর কতক-কতক হারিয়ে গেছে। কিন্তু ধোপার খাতায় লেখা প্রথম পঞ্চাশটি আমার কাছে আছে। আমার কথামতো চলিস যদি, মাঝে মাঝে এক-আধটা শোনাতে পারি।

'ছোটঠাকুরদা মারা যাবার আগে আমার উপর খুশি হয়ে ওই খাতাটা আমাকে দিয়ে গেছেন। এখন ওটি আমার কাছে আছে। তোমরাও যদি আমার কথামতো চলো তো মাঝে মাঝে এক-আধটা শোনাতে পারি।'

সেকালে

পঁয়ষট্টি বছর আগে আমার মামাবাড়ির দেশে একদিকে যেমন সাধুসজ্জনের ভিড় ছিল এবং তার ফলে পুজোপার্বণ, তিথিপালন, হরির লুট, ব্রাহ্মণভোজন, কাঙালিবিদায় লেগেই থাকত, আবার তেমনি অন্যদিক দিয়ে ঠগ-ঠ্যাঙাড়ে, জোচ্চোর-বাটপাড়েরও এমনি উপদ্রব ছিল যে, দিনের বেলাতেও কেউ একা নির্জন পথে বেরুতে সাহস পেত না।

তখন লোকের অবস্থাও ছিল ভালো। খাওয়া-দাওয়ার কারো অভাব ছিল না, পুকুরে প্রচুর মাছ, গোয়ালঘরে বড়ো বড়ো দুধি গাই, বাগানে অপর্যাপ্ত শাকসবজি, ফলপাকুড়, কোনো ভিখিরি কখনো গৃহস্থের বাড়ি থেকে খালি হাতে ফিরে যেত না।

কিন্তু তাহলে হবে কী? দুষ্টু লোকদের ঠেকানো কারো সাধ্য নয়; উপরন্তু দু-একজন ছিঁচকে চোর ছাড়া কেউ বড়ো-একটা ধরাই পড়ত না, তা তাদের সাজা দেওয়া হবে কী করে? সে সময়ে ওই অঞ্চলের জেলখানাগুলো বারোমাস খালি পড়ে থাকাতে গ্রামের পঞ্চায়েতের পরামর্শে নাকি সেসব ঘরগুলি গরিবদের কাছে অল্প দামে ভাড়া দেওয়া হত, আর ওই ভাড়ার টাকা থেকে শীতকালে ওই গরিবদেরই লাল কম্বল কিনে দেওয়া হত। কিন্তু সৎকাজের সবসময় ভালো ফল হয় না। চুরি-ডাকাতি উত্তরোত্তর বেড়েই যেতে লাগল।

শেষকাণ্ডে এমন হল যে, সরকারি খাজাঞ্চিখানার এক দিকের দেয়াল রাতারাতি কারা কেটে নিয়ে যথাসর্বস্ব তো নিয়ে গেলই, উপরন্তু দেয়ালের ইটগুলি খুব মজবুত হওয়াতে সেগুলিকে সুদ্ধ যে গোরুর গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে গেল, চাকার সব দাগ থেকেই তা বোঝা গেল। সমস্ত অস্ত্রধারী পাহারাওয়ালা, চৌকিদার, জমাদারদের মুখে কাপড় বেঁধে একটা ছোটো কুঠরিতে তালা-চাবি বন্ধ করে এই কাজটি সারা হল, বাইরের কাকপক্ষীটি কিছু টেরই পেল না। পাহারাওয়ালারা শুধু এইটুকু বলতে পারল যে, লোকগুলো দারুণ ষণ্ডা আর বীভৎস সব মুখোশ দিয়ে সারা মুখটা ঢাকা।

এত সব উপদ্রবের মধ্যে যে আমার মামাবাড়ির লোকরা নিশ্চিন্ত আরামে বসবাস করতে লাগলেন, ছেলে-মেয়েদের পইতে ও বিয়ে উপলক্ষে তাল তাল সোনার গয়না গড়িয়ে, পাড়াসুদ্ধ সকলকে দেখিয়ে বেড়াতে লাগলেন, তার একমাত্র কারণ হল নাকি ওদের গুরুদেবের আশীর্বাদ।

আমার ছোটোমামার কাছে শুনেছি যে গুরুদেবটি যে-সে লোক ছিলেন না। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা দুই হাত, ফর্সা রং, তাল-ঢ্যাঙা মানুষটি। আর শরীরে সে কী শক্তি! একবার বাঁ-হাতে একটা পাগলা মোষের শিং চেপে ধরে তাকে এমনি বশ করে ফেলেছিলেন যে সেই অবধি সে কুকুর-বাচ্চার মতো তাঁর পিছনে পিছনে ঘুরত, কেউ কাছে এলেই ল্যাজ নাড়ত।

গুরুদেবের অবিশ্যি খুবই নামডাক, খুবই চাহিদা, তাই বারোমাস গাঁয়ে থাকা তাঁর ঘটে উঠত না। দুটি শিষ্য নিয়ে আসতেন যেতেন, দু-দিন এর বাড়ি দু-দিন ওর বাড়ি আতিথ্য গ্রহণ করে সকলকে আশীর্বাদ করে চলে যেতেন। ঠিক আতিথ্যও বলা যায় না, কারণ সাধুসজ্জন মানুষ, কারো বাড়ির মধ্যে পদার্পণ করবেন না, উঠোনে তাঁদের জন্য কানাত ফেলা হত। নিজেরা রান্না করে নিরামিষ খেতেন, তার জন্য কাঁচা ফল, তরকারি, দুধ, ছানা শিষ্যরা জোগান দিত। টাকাকড়ি যে যা পারত প্রণামিও দিত, কিন্তু গুরুদেব কখনো কিছু চাইতেন না। লোকে খুশি হয়ে চ্যালাদের হাতে যা-খুশি দিত। তারাও সেটাকে খুশি হয়ে মাথায় ঠেকিয়ে ছোটো-একটা কালো সিন্দুকে তুলে রাখত। যাবার সময় সিন্দুকটি কাঁধে করে নিয়ে যেত, আবার দরকার হলে গরিব-দুঃখীকে সিন্দুক খুলে টাকা-পয়সা দানও করত।

গুরুদেবের ক্ষমতাও ছিল অনেক। ফোঁটা দিয়ে, বড়ি দিয়ে, মাদুলি দিয়ে সাধারণ রোগ তো সারিয়েই দিতেন, আবার তেমন কঠিন ব্যামো হলে অনেক সময় চাই কী শহরের হাসপাতালে যাবার খরচটাও দিয়ে দিতেন। কাজেই লোকে যে তাঁদের দেবতার মতো ভক্তি করবে এতে আর আশ্চর্য কী?

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, গাঁয়ের বুড়োরা গুরুদেব সম্বন্ধে যতটা উৎসাহী ছিলেন, ছেলে-ছোকরারা ততটা ছিল না। বিশেষ করে আমার ছোটোমামা ও তাঁর বন্ধুরা। তার একমাত্র কারণ অবিশ্যি হিংসে ছাড়া আর কিছু নয়।

গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা ছাড়া তাদের মনে আর কিছুই থাকা উচিত ছিল না। কারণ ধর্মের কথা নাহয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু গুরুদেব যাদের বাড়িতে একবার পায়ের ধুলো দিয়েছেন, তাদের বাড়ির লোকদের আর কখনো যে কিছু খোয়া যেত না, এটা তো কম কথা নয়!

সমস্ত শীতটা গুরুদেব গাঁয়ে থেকে ফাল্গুন মাসের শেষের দিকে চলে যেতেন; আবার পৌষ পড়লে এসে হাজির হতেন। মাঝের ক-টা মাস গাঁয়ের লোকেরা তাঁর আগমনের আশাতেই কাটিয়ে দিত। আর এমনি ছিল তাঁর তেজের মহিমা যে কেউ যদি তাঁর অনিষ্ট বা নিন্দামান্দা করেছে তো তার একটা বড়ো ক্ষতি হবেই হবে। ফিরে এসে তাই শুনে অবিশ্যি গুরুদেব খুবই দুঃখ করতেন।

একবার ছোটোমামা পড়ে গেলেন মহা ফাঁপরে। পাড়ার কতকগুলি আড্ডাবাজ ছেলে মিলে একটা ক্লাব খুলেছিল। সেখানে তাস পেটা জুয়ো খেলা, লুকিয়ে লুকিয়ে সবই চলত। ছোটোমামা তাঁর একটি গুণধর বন্ধুর পাল্লায় পড়ে ওর মধ্যে জড়িয়ে পড়েন, মেলা টাকা হেরে শেষটা আর উপায় না দেখে গাঁয়ের মহাজনের কাছে ধারধোর করে, সেসব শোধ না-করেই, আবার ছুটির শেষে কলকাতার কলেজের মেসে পালিয়ে গেলেন।

এদিকে মহাজন মহা চটে গিয়ে চিঠি লেখালেখি শুরু করেছে, বাড়িতে বলে দেবে বলে ভয় দেখাচ্ছে। ছোটোমামার বয়স তখন আঠারো কি উনিশ হবে, সে-রকম বুদ্ধিও পাকেনি। বেজায় ঘাবড়ে গেলেন। তখন হঠাৎ গুরুদেবকে মনে পড়ল। কতবার ওই গুরুদেবকে নিয়েই বন্ধুমহলে হাসিতামাশা করেছেন। এবার বিপদের সময় কিন্তু মনে মনে দিনরাত গুরুদেবকে ডাকতে লাগলেন। আর কেবলই মনে হতে লাগল যে গুরুদেব নিশ্চয় একটা হিল্লে করে দেবেন।

হলও তাই। পুজোর ছুটিতে দারুণ দুশ্চিন্তা নিয়ে আবার দেশে যাচ্ছেন। পথে সন্ধ্যা নেমে গেছে, চারদিক অন্ধকার করে দারুণ মেঘও করেছে। মাঝপথে ছোটো একটা জংশনে গাড়ি বদল করতে হয়। স্টেশন মানে একটা শেডের মতো, তারই পাশে একটা কুঠরিতে স্টেশনমাস্টারের আপিস, আর শেড-বোঝাই গুড়ের নাগরি ও দিশি খেজুরের তাল। সবটা থেকে একটা সোঁদা সোঁদা গন্ধ বেরুচ্ছে। সেই আধো অন্ধকারে মিনিট পনেরো অপেক্ষা করতে হবে।

ছোটোমামার তো বুক ঢিপঢিপ করছে। খালি মনে হচ্ছে গুড়ের ভাঁড়ের ওপাশে যেন দুটো লোক গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। তারপর যেই-না দূর থেকে ট্রেনের আলো দেখে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ছোটোমামা দু-পা এগিয়েছেন, অমনি অন্ধকারের মধ্যে থেকে দুটো কালো মুসকো লোক এসে তাঁর দু-ঘাড়ে বিরাশি সিক্কা ওজনের দুই হাত রেখেছে। ছোটোমামা তো পাথর হয়ে গেছেন!

কানের কাছে মুখ এনে এক জন বললে, 'ইশ, ভারি ভালোমানুষ বনে গেছিস দেখছি! খ্যাঁদা নাকের উপর আঁচিলটা না দেখলে তো চিনতেই পারতাম না। নে ধর, ভণ্ড কোথাকার! তোর আশায় বসে বসে হাত-পায়ে ঝিঁঝি ধরে গেছে।' ততক্ষণে ট্রেনটাও এসে লেগেছে, আর দু-চারজন লোকও স্টেশনমাস্টারের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। লোক দুটো ছোটোমামার মুঠোর মধ্যে একটা ছোটো কালো থলি একরকম জোর করে গুঁজে দিয়ে নিমেষের মধ্যে পিঠটান দিল। এক হাতে নিজের গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ, অন্য হাতে থলিটা নিয়ে ছোটোমামা গুটিগুটি সামনেই যে গাড়ি পেলেন তাতে উঠে পড়লেন। গাড়িও ছেড়ে দিল।

একক্ষণে ছোটোমামার জ্ঞানবুদ্ধি ফিরে এসেছে, নেড়ে দেখেন, ব্যাগটা দারুণ ভারী। চারদিকে চেয়ে দেখেন গাড়িতে আর দ্বিতীয় মানুষ নেই, ভুল করে ফার্স্ট ক্লাসে চড়ে পড়েছেন। তখনকার দিনে গাড়ির আলো এত উজ্জ্বল ছিল না, সেই টিমটিমে আলোতেই থলির মুখের দড়ি খুলে, একবার তাকিয়েই ছোটোমামা আরেকটু হলেই মূর্ছো খেয়ে পড়েই যাচ্ছিলেন! থলিটার গলা অবধি হিরে, জহরত, সোনার গিনি দিয়ে ঠাসা! সবচেয়ে উপরে একটা লাল পাথরের আংটি জ্বলজ্বল করছে, তার গায়ে মকরের মুখ খোদাই করা।

'জয় গুরুদেব' বলে এক মুঠো গিনি যেই-না ছোটোমামা হাতে করে তুলেছেন, অমনি জানলা দিয়ে একটা যমদূতের মতো লোক গলে এসে, তখন জানলায় শিক লাগানো থাকত না, ঝুপ করে সিটের উপর এসে পড়ল। ছোটোমামা অবাক হয়ে দেখলেন, তার কুচকুচে কালো হাতে একটা বেঁটে-মোটা মুগুরের মতো কী, আর মুখে একটা বিকট মুখোশ, তার নাকের কাছটা ফাঁকা। সেইখান দিয়ে খ্যাঁদা একটা কালো নাক বেরিয়ে রয়েছে, তার উপরে বিরাট একটা আঁচিল!

লোকটি হাত বাড়িয়ে বললে, 'বা-ব্বা! দিব্যি তো গুছিয়ে নিয়েছ চাঁদ! এবার দাও দিকিনি থলিটা! খুব লোক বাবা তুমি!' ছোটোমামা কোনো আপত্তি না করে থলিটা তার হাতে দিয়ে দিলেন। গিনিগুলিও দিয়ে দিচ্ছিলেন, কিন্তু লোকটা ফিক করে হেসে থলির মুখ বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল। 'আহা, অত ভালোমানষি নাই-বা দেখালে! চারটি তোমার টিপিন খাবার পয়সা বলেই নয়তো রেখে দাও।' বলে একে লাফে যেরকমভাবে এসেছিল, তেমনিভাবে জানলা গলে চলে গেল! ছোটোমামাও বারবার গুরুদেবের উদ্দেশে প্রণাম করে গিনি ক-টি পকেটস্থ করলেন।

তারপর যথাসময়ে দেনা শোধ করে ছোটোমামা কুসঙ্গ ত্যাগ করে, আগ্রহের সঙ্গে গুরুদেবের আগমনের অপেক্ষায় থাকলেন। পৌষ মাসের আরম্ভেই শ্যামলবাবুদের বাগানে গুরুদেবের তাঁবু পড়েছে শুনে ছোটোমামা আগে-বাগে ছুটে গিয়ে গুরুদেবের দুই পা জড়িয়ে ধরলেন। গুরুদেবও উদ্ধত ছেলেটার সুমতি হয়েছে দেখে মহা প্রসন্ন হয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করলেন, আর পাশের ফুলের সাজি থেকে একটা আশীর্বাদি স্থলপদ্ম তুলে তার হাতে দিলেন।

ছোটোমামা হাত জোড় করে ফুল নিতে যাবেন, হঠাৎ চোখে পড়ল গুরুদেবের ডান হাতের বকবার আঙুলে একটা লাল পাথর-দেওয়া আংটি জ্বলজ্বল করছে, তার গায়ে মকরের মুখ খোদাই করা। ভীষণ চমকে গিয়ে ছোটোমামা গুরুদেবের মুখের দিকে চাইলেন। গুরুদেব দু-চোখ বুজে মুচকি মুচকি হাসছেন।

টাইগার

তাকে উলটে দেখলাম থাবার তলাটা গোলাপি মখমলের মতো, মাঝে-মাঝে কচি কচি সাদা লোম। পেটের তলাটাও গোলাপি— নরম তুলতুলে এক জায়গায় একটা শিরা না কী যেন ধুকধুক করছে। মুণ্ডুটাকে তুলে আবার নিজের পেট দেখতে চেষ্টা করছে, চোখ দুটো বিলবিল করছে। মুখের কাছে তুলে ধরতেই কচি একটা লাল জিভ বের করে আমার গাল-গলা চেটে দিতে লাগল। আঃ!

একটু দুধ পেলে বেশ হত। খুকুর বাটিটা হাতে নিয়ে গুটিগুটি গেলাম রান্নাঘরের দরজার কাছে।

'ও পিসিমা, একটু দুধ দেবে?' পিসিমা হাসি হাসি মুখ করে হাতা ভরে দুধ নিয়ে দরজার কাছে এলেন।

'খিদে পেয়েছে বুঝি, দেখি বাটি!'

বাটি এগিয়ে দিলাম।

পিসিমা হাতা হাতে অবাক হয়ে আমার বগলের দিকে চেয়ে রইলেন।

'ছি, ছি, ওটাকে ফেলে দে বলছি! ভারি নোংরা জানোয়ার, ঘর-দোর একাকার করবে এখুনি!'

বাচ্চাটাকে তুলে ধরলাম, 'দেখো, পিসিমা, কীরকম গুলগুল করে তাকাচ্ছে। দাড়ির নীচে খাঁজগুলো দেখো!'

পিসিমা দুধের হাতা মাটিতে ফেলে দিয়ে দু-হাত সরে গেলেন— 'আহা, কী করিস, কী করিস, রান্না করছি যে! ভালো চাস তো যেখান থেকে এনেছিস সেখানে দিয়ে আয়!'

বাচ্চাটাকে নীচে নামিয়ে দিলাম। লাল একটা খুদে জিভ দিয়ে চুক্‌চুক্ করে মাটি থেকে দুধ চেটে খেতে লাগল। পিসিমা কি দেখতে পাচ্ছেন না?

পিসিমা বললেন, 'তোমার বাবা একবার দেখলে হয়! এমনিতেই বিষম রেগে আছে, তোমার দাদা-রত্নটি অঙ্কে বারো পেয়েছে। তাই নিয়ে অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা হয়ে গেছে। এখন ছুটির দিনে চাঁদ, তুমি এলে নেড়ি কুত্তোর বাচ্চা কোলে করে। তাও যদি মোটাসোটা সাদা রঙের হত! তোমার কপালে আজ কী আছে কে জানে! তোমার রিপোর্ট এসেছে? যাও-না উপরে, কী হয় দেখো'!

বিষম রাগ হল। বাচ্চাটাকে তুলে নিতে চেষ্টা করলাম।

'পিসিমা ভালো না, খাস না ও দুধ। আমি তোকে ভালো দুধ কিনে দেব।'

কিন্তু বাচ্চাটা কিছুতেই ছাড়বে না, ভীষণভাবে দুধ চেটে সাফ করে দিতে লাগল।

—'কী নাম রাখা যায় বল তো?'

দাদা চোখ খুলে বলল, ' ''টাইগার'' বেশ নাম।'

আমি বাচ্চাটাকে শূন্যে উঁচু করে ধরে বললাম, 'এই টাইগার! বুক তুলে মাথা উঁচু করে দাঁড়া! টাইগার হয়েছিস, ব্যাঘ্র হয়েছিস।'

টাইগার শূন্যের উপর ল্যাজ নাড়তে চেষ্টা করতে লাগল। পিসিমা উঠোন থেকে আমাকে ডাকতে ডাকতে খিড়কি দরজা অবধি এলেন। দাদা বললে, 'যা শিগগির!' বলেই কাঁটা-ঝোপটার পেছনে লুকিয়ে পড়ল। আমি আস্তে আস্তে পা টানতে টানতে পিসিমার কাছে গেলাম।

—'আচ্ছা ছেলে বাপু তুমি! বারোটা বাজল, স্নান নেই, খাওয়া নেই! তোমার মা এলে আমি বাঁচি!'

আমি বললাম, 'মা এলে আমিও বাঁচি। আমার অসুখ করেছে, আমি স্নানও করব না, খাবও না।' বলে আমি খুব খানিকটা কেঁদে-টেঁদে পিসিমাকে ব্যস্ত করে তুললাম।

শেষটা গরম জল দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে মুছে কাপড় ছেড়ে শুতে গেলাম। দাদা যে কোথায় গেল?

পিসিমা বললেন, 'যাই বাবা, খাওয়ার পালা সেরে আসি। বেশ ছুটির দিনটা কাটছে! এক জনের অঙ্কে বারো পেয়ে খাওয়া বন্ধ, এক জনের শরীর খারাপ, বাপ গেলেন মাছ ধরতে। যাই আমি একাই খানিকটা গিলে আসি।'

তাই বলো! দাদা অঙ্কে বারো পেয়েছে বলে দাদার খাওয়া বন্ধ। কাল দাদা আমাকে কয়েকটা রঙিন খড়ি দিয়েছিল। বালিশে মুখ গুঁজে খানিকক্ষণ শুয়ে থাকলাম।

পিসিমা খেয়ে-দেয়ে এসে, পাশের ঘরে মাটিতে মাদুর পেতে শুয়ে পড়লেন। আমাকে ডেকে বললেন, 'কুকুরবাচ্চাটার কী করলে? ওসব নোংরা জিনিস ঘাঁট বলেই তো শরীর খারাপ হয়। এখন থাকো চুপ করে শুয়ে, তোমার রিপোর্ট হারানোর কথা শুনলে তো আছে বিকেলে আরেক পালা। তোমরা দু-টি ভাই দু-টি মানিকজোড়! নাও, এখন ঘুমোও তো!'

একটু পরেই সুড়ুত সুড়ুত করে পাখি উড়ে যাওয়ার মতো আওয়াজ করে পিসিমা নাক ডাকাতে লাগলেন।

আমিও উঠে পড়ে বাগানে চলে গেলাম। দাদা কাঁটাঝোপের ছায়ায় টাইগারকে নিয়ে খেলা করছে। বললাম, 'দাদা, চল, টাইগারকে নিয়ে কোথাও চলে যাওয়া যাক।'

দাদা বললে, 'কোথায় যাবি?'

—'কেন মামাবাড়িতে, মার কাছে। ওরা টাইগারকে দেখে খুব খুশি হবে। ওরা কুকুর ভালোবাসে, বেড়াল ভালোবাসে, কাকাতুয়া ভালোবাসে, খরগোশ ভালোবাসে। চল দাদা, হেঁটেই চলে যাওয়া যায় না?'

দাদা মাথা নাড়ল, 'না রে সে অনেক দূর। জানিস, আমার এ-বছর সার্কাস দেখা বন্ধ, সিনেমা দেখা বন্ধ, আসছে রবিবার মা এলে তোরা সবাই পিকনিকে যাবি আমি যাব না।'

আমি উঠে পড়ে দাদার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে অনেকটা এগিয়ে আনলাম।

—'দাদা তুই একটা স্টুপিড! অঙ্কে বারো পাস কেন? আমি তো বত্রিশ পেয়েছি।'

দাদা কোনো উত্তর না দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল।

কুকুরবাচ্চাটা এসব দেখে মহা কেঁই-কেঁই জুড়ে দিল। তাকে আবার কোলে নিতে হল।

দাদা বলল, 'ওকে কোথায় পেলি?'

—'শিকদারদের মালী ওকে বেচে দিয়েছে। ওর মার সাতটা বাচ্চা হয়েছিল। একটা রেখে সব ক-টা বিলিয়ে দিয়েছে। বুড়ো শিকদার মশাই নাকি বলেছেন, একটা রেখে সব ক-টাকে জলে ডুবিয়ে দাও।'

—'ই-শ্! কী নিষ্ঠুর!'

—মালী কিন্তু জলে ডুবোয়নি। চার আনা করে দামে বেচে দিয়েছে। বলেছে নাকি বিলিতি কুকুরের খুব দাম হয়। আমি চার আনা দিয়ে ওকে কিনেছি।'

—'পিসিমাও ওকে রাখতে দেবে না, আর বাবাও দেবে না। কুকুরবাচ্চা কেন জন্মায়?'

—'এই টাইগার, তুই জন্মালি কেন? তোকে কেউ চায় না।' টাইগার তাই শুনে আনন্দের চোটে আমার কোলে নেচে-কুঁদে, ল্যাজ নেড়ে, ঘেউ ঘেউ শব্দ করে একাকার! দাদাকে বললাম, 'বাবা কখনো ওকে রাখতে দেবে না, দাদা। আমার রিপোর্টটা কোথায় হারিয়ে গেছে।'

দাদা বিরক্ত হয়ে টাইগারকে একটু ঠেলে দিল, টাইগার মহা খুশি হয়ে ছুটতে ছুটতে এসে, দাদাকে খেলা করে কামড়ে দিতে লাগল। ছোট্ট ইঁদুরের ল্যাজের মতো ল্যাজ, নড়ে নড়ে খসে পড়বার জোগাড়!

দাদা রাগ রাগ গলায় বলল, 'জেনে-শুনে আনলি কেন? বাবা যদি রামদীনকে বলে ওকে জলে ডুবিয়ে দিতে?'

—'ইশ, বাবা কক্ষনো বলবে না।'

—'আজ বলতে পারে।'

আমি চুপ করে রইলাম।

দাদা টাইগারকে কোলে নিয়ে বললে, 'চল, চলে যাই। বাবা বলেছে আমার লেখাপড়া হবে না। তাহলে তোরও বোধ হয় হবে না। হেঁটে হেঁটেই মামাবাড়ি চল। কত লোক তো হেঁটে হেঁটে জগন্নাথ দেখতে পুরী যায়।'

তখন আমরা আস্তে আস্তে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। দাদার পায়ে জুতো ছিল, আমার খালি পা, হাঁটতে হাঁটতে বিকেল হয়ে গেল। আমার জলতেষ্টা পাচ্ছিল, পা ব্যথা করছিল। কত সব বাড়ি-টাড়ি ছাড়িয়ে চলে গেলাম, পাড়া-গাঁ সব এসে গেল। এক জায়গায় এক জনের বাড়িতে জল খেলাম, টাইগারও খেল।

বিকেল হয়ে গেল, সন্ধ্যে হয়ে গেল। দাদা হাঁটছে তো হাঁটছেই। শেষটায় আমি একটা বড়ো গাছের গুড়িতে ঠেস দিয়ে বসে পড়লাম।— 'দাদা, আমি আর হাঁটতে পারছি না।'

দাদা আমার পাশে বসে আমার পায়ের গুলি টিপে দিতে লাগল। আমি কোলের উপর টাইগারকে নিয়ে পা ছড়িয়ে বসলাম, আর দাদা আমার পা টিপে দিল। শেষটা দু-জনেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

যখন রাত আটটা-নটা হবে, বাবা এসে আমাদের বাড়ি নিয়ে গেল। গাড়ি নিয়ে খুঁজে খুঁজে দেখল গাছতলায় তিন জনে ঘুম লাগাচ্ছি।

দাদা গাড়িতে উঠে টাইগারকে জাপটে ধরে বাবাকে বলল, 'খুব ভালো বিলিতি কুকুর বাবা। মন্টু চার আনা দিয়ে কিনেছে। বড়ো হয়ে খুব ভালো শিকারি কুকুর হবে। আমাদের বাড়ি পাহারা দেবে।'

বাবা কিছু না-বলে গাড়ি চালাতে লাগল।

তখন আমি কেঁদে ফেললাম।

—'তুমি কি ওকে জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলবে? ওর নাম টাইগার।'

বাবা খ্যাঁচ করে গাড়ি থামিয়ে আমাদের বলল, 'কেন, আমি কি একটা পাষণ্ড?' আমরা কেউ কিছু বললাম না দেখে আরও বলল, 'বেশ নাম টাইগার। একটা কলার কিনতে হবে, লাইসেন্স করাতে হবে।'

আমি বললাম, 'লাইসেন্স কেন করাতে হবে বাবা? গাড়ির লাইসেন্স তো আছে।'

দাদা বলল, 'স্টুপিড! ফুল!'

বাবা বলল, 'আমি যখন ছোটো ছিলাম, একটা নেড়ি কুত্তোকে বাড়িতে এনেছিলাম। আমার বাবা তাকে কিছুতেই বাড়িতে ঢুকতে দেবে না, সেও কিছুতেই যাবে না। রোজ আমাদের দরোয়ান তাকে ঠেঙিয়ে তাড়িয়ে দিত, আর রোজ সে ঘুরে ঘুরে ফিরে আসত। শেষটা দরোয়ানের ভাই একদিন তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। লোকটা ভালো ছিল। ওই কুকুরটার নাম দিয়েছিলাম বাঘা।'

টাইগার কী বুঝল জানি না, এই পর্যন্ত শুনে হঠাৎ বাবার কনুই কামড়ে দিল। আমি তো ভয়েই আধমরা। বাবা জায়গাটা একটু ঘষে বলল, 'আরে! ব্যাটার তো এরই মধ্যে খুব দাঁতের জোর হয়েছে!'

প্রশংসা পেয়ে টাইগার আহ্লাদে আটখানা হয়ে মাথা দিয়ে বাবাকে প্রাণপণে ঠেলতে লাগল।

চোর

ঠিক যেই নিতাইদের বাড়ির পেছনের সেই ঝাঁকড়াচুলো ঝোপটার কাছে এসেছি, পকেট হাতড়ে দেখি যে আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে! সেই কানামোড়া আধময়লা নোটটা কে যেন বুকপকেট থেকে তুলে নিয়েছে!

ভীষণ ঘাবড়ে গেলাম। ভয়ের চোটে কোট খুলে, শার্ট-প্যান্ট ঝেড়ে-ঝুড়ে ভালো করে খুঁজে দেখলাম। জুতো-মোজা খুলে তার ভেতর হাতড়ে দেখলাম। কোথাও কিছু নেই।

গলা শুকিয়ে গেল। বাবা যে রোজ বলেন আমার আলজিভটা আর টনসিল দুটো বেড়ে বেড়ে গলার ফুটো একেবারে বন্ধ করে ফেলেছে, একথা যে সত্যি তা টের পেলাম। চুলগুলো শির শির করে একে-একে সব উঠে দাঁড়াল, আর তার ফাঁকের মধ্যে দিয়ে ঠান্ডা মতন কীসের হাওয়া বইতে লাগল। আজকে ওই নোট হারানো মানে একেবারে আমার সর্বনাশ হওয়া। পিসিমা বার বার বলে দিয়েছেন— তাঁর সেমিজের ছিট ছ-গজ, তাঁর নাতির হাতওয়ালা গেঞ্জি দুটো, হলদে জুতো একজোড়া— আমার মাপের হলেই চলবে; এইসব কিনে যদি কিছু বাকি থাকে, সেই দিয়ে আমার সেই রঙিন খড়ির বাক্স কিনতে পারি। আর, সে-বাক্স আজ না কিনলে, কাল ইস্কুলে আমার যে কী অবস্থা হবে, তা জানবে শুধু গোবিন্দবাবু আর আমি, আর ক্লাসের বাকি উনত্রিশটা ছেলে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে অবধি কী কী করেছিলাম, ভালো করে ভেবে দেখলাম। গেটের বাইরের সেই আশ্চর্য লোকটার কথা টপ করে মনে পড়ে গেল। এখন মনে হল, তার মুখটা কেমন চোর চোর মতন। তখন বুঝতে পারিনি; ভেবেছিলাম— চেনা চেনা লাগছে কেন? মনে পড়ল যে শুনেছি, কানের ছালটা ঝুলঝুল না করে মাথার সঙ্গে জোড়া থাকলে বুঝতে হবে লোকটা সুবিধের নয়। তায় আবার চোখদুটো সরু সরু লম্বা লম্বা, নাকের দু-পাশে খুব কাছাকাছি পিটপিট করছে। ঝাঁটার মতো গোঁফ, তিন দিনের দাড়ি। ও-ই চোর না হয়ে যায় না। ওর সারা মুখে যেন তাই লেখা আছে।

আমি কেন তখন টের পাইনি? সে আমার দিকে খানিক তাকিয়ে বলেছিল, 'দেশলাই আছে?' আমি রেগে বলেছিলাম, 'আমি বিড়ি খাইনা।' সে বলেছিল, 'বিড়ির জন্য নয়; আমারও গুরুদেবের বারণ আছে। হুঁকো?— হ্যাঁ; চুরুট?— হ্যাঁ; পাইপ? —হ্যাঁ; কিন্তু বিড়ি কখনো না। আমার একটা দরকারি কাগজ পড়ে গেছে কি না, অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছি না তাই।'

তখন দু-জনে হামাগুড়ি দিয়ে খানিকটা খুঁজলাম। নিশ্চয় সেই সময়ে কখন টুপ করে আমার সেই কোনামোড়া আধময়লা পাঁচ টাকার নোটখানি সে তুলে নিয়েছে। মনে হল 'পেয়েছি' বলে

সে এমনি হঠাৎ ঘুরেছিল যে, আমি তার পেছনের ধাক্কা খেয়ে ধপ করে মাটিতে বসে পড়েছিলাম। সে-ই যে চোর— এর কোনো সন্দেহ নেই।

তখুনি ফিরে তার সন্ধানে চললাম। অন্ধকারে তাকে চিনতে না পেরে একেবারে তার উপর দিয়ে আরেকটু হলেই হেঁটে যাচ্ছিলাম। সে জামা-টামা ঝেড়ে বলল, 'কিছুতে তাড়া করেছে নাকি?' আমি বললাম, 'না, তোমার সঙ্গে সঙ্গে যেতে ইচ্ছে করল।'

সে কিছু না বলে এক বার আমার দিকে তাকিয়ে আবার এগুতে লাগল।

পথে তার সঙ্গে অনেক কথা হল, কিন্তু আমার মনটা তার বুকপকেটের মধ্যে আনাগোনা করতে লাগল।

একটু দূরে বাস স্টপের কাছে এসে সে বলল, 'আর হাঁটা যায় না। চলো, বাসে যাই।'

দু-জনে বাসে উঠলাম, পাশাপাশি বসলাম। কন্ডাক্টর পয়সা চাইলে, সে-ই দু-জনের হয়ে টিকিট কাটল; ভাবলাম— হঠাৎ বড়োলোক হয়েছে, তা আর কাটবে না?

দু-জনেরই ঘুম পাচ্ছিল। একদিক দিয়ে ভালোই। আমি চাই সে ঘুমোয়, আবার আমি সুদ্ধ ঘুমিয়ে পড়লে তো চলবে না। সে চাই কী আমার জুতো জোড়াটা হয়তো পা থেকে খুলে নিয়ে নেমে পড়বে। কন্ডাক্টরের তো উপর দিকে এত বড়ো পাগড়ি আর নীচের দিকে এত বড়ো দাড়ি যে, কিছু দেখতে পায় কি না সন্দেহ!

তাই আমি তাকে মামাবাড়িতে ডাকাত পড়ার একটা গল্প বানিয়ে বানিয়ে আস্তে আস্তে একটানা সুরে বলতে লাগলাম, আর সে একটু অন্যদিকে তাকালেই আস্তে আস্তে তার পিঠ চাবড়াতে লাগলাম, যাতে সে শিগগির ঘুমিয়ে পড়ে। সেই একঘেয়ে গল্পের চোটে আমার সুদ্ধ ঘুম পেতে লাগল।

হঠাৎ চমকে দেখি, সে তার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ঘুমোচ্ছে, মাথাটা বাসের ঝাঁকুনিতে একটু করে নড়ছে, আর বুকপকেটটা একটু হাঁ হয়ে রয়েছে। তার মধ্যে ভাঁজকরা একটা কোনামোড়া আধময়লা পাঁচ টাকার নোট!

আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল, আমি এদিক-ওদিক দেখে হঠাৎ টুপ করে সেটি তুলে নিলাম।

প্যান্টের পকেটে সব পুরেছি, বাসটা একটা ঝাঁকুনি দিল আর সেও সোজা হয়ে বসে চোখ রগড়াতে লাগল। আমি যত জোর করে আমার চোখদুটোকে অন্যদিকে ঘুরোতে চাই, সে-দুটো তবু ফিরে ফিরে ওর ওই হাঁ-করা পকেটের দিকে তাকায়।

বাস থেকে নেমে বাঁচলাম। সে একদিকে চলে গেল, আমি আরেক দিকে চলে গেলাম। ছিট কিনলাম, গেঞ্জি কিনলাম, জুতো কিনলাম, খড়ি কিনলাম। যতক্ষণে বাড়ি ফিরলাম, সেই লোকটার কথা ভুলেই গেছি।

বাড়ি এসে পিসিমাকে জিনিসপত্র দিয়ে ঘরে গিয়ে পড়ার টেবিলে খড়ি রাখতে যাব, যা দেখলাম তাতে আমার একেবারে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল! পেটের ভিতর কীরকম করতে লাগল, টনসিল দুটো আবার বড়ো হয়ে গলাটাকে ঠুসে ধরল!

দেখলাম— দোয়াত চাপা-দেওয়া কানমোড়া আধময়লা পাঁচ টাকার নোটটা, সেই যে বাড়ি থেকে বেরোবার আগে জুতো পরবার সময় যেমন রেখেছিলাম, ঠিক তেমনটি রয়েছে!

সেই লোকটার পকেট থেকে নেওয়া ও খরচ করা সেই নোটটার কথা মনে করে আমার হাত-পা যেন পেটের ভিতর সেঁদিয়ে গেল।

কাকে কী বলব? তোমরাই বলো, সেই লোকটাই চোর, কি আমিই চোর?

লোমহর্ষণ

রাজামশাই ব্যস্ত হয়ে দরদালানে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন, খিদেয় পেটের এ-দেয়াল ও-দেয়াল একসঙ্গে লেপটে যাচ্ছে, টেবিল পাতা, সোনার বাসন-কোসন সাজানো, মুক্তো-বসানো গেলাসে কেয়ার গন্ধ-দেওয়া জল, রানি ওদিকে মখমলের গদির উপর বসে চাকুমচুকুম আওয়াজ করছেন, অথচ খাবার দেবার নাম নেই।

মন্ত্রীমশাইয়েরও জিভ শুকিয়ে ঘুঁটে, বিশেষ কিছু মুখে বলছেন না বটে কিন্তু পেটের মধ্যে কী যে হচ্ছে দেবতারাই জানেন।

অগত্যা আর থাকতে না পেরে রাজামশাই মন্ত্রীকে বললেন, 'মন্ত্রী, যাও তো একটু অনুসন্ধান করো।' মন্ত্রী পাশের ঘরে গিয়ে লাল পোশাকপরা প্রহরীদের বললেন, 'খবর নিয়ে আয়।'

তারা রান্নাবাড়ির সদর দরজায় ভাণ্ডারী মশাইকে বললে, 'খাবার দেয় না কেন খবর নিন।'

তিনি বাবুর্চিখানার বাইরে দাঁড়িয়ে নাক টিপে দরজার ভিতর মুণ্ডু ঢুকিয়ে বললেন, 'খাঁবার দেঁতা নেই কাঁইকু?'

খাস খানসামা সাজ-পোশাকপরা মোটাসোটা বাঙালি মানুষ, হাতের উপর রেশমি ঝাড়ন নিয়ে দৌড়ে এসে বললে, 'চপ, কাটলেট, সুপ, স্যালাড সব তৈরি, ছোকরা বেল দেয় না, তাই খাবার দিতে পারছি না।'

—'যাও, দেখো, কেন ঘণ্টা দেয় না।'

খাস খানসামা ছোটো খানসামাকে বললে, 'যাও, দেখো, ছোকরা কোথায় গেল।'

ছোটো খানসামা ঘণ্টাতলায় গিয়ে দেখে ছোকরা সেখানে ঘণ্টাগাছে ঠেস দিয়ে কী একখানা বই পড়ছে, তার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, চুল খাড়া হয়ে আসছে, মুখ হাঁ হয়ে গেছে। বই কেড়ে, তার দুই কান আচ্ছাসে পেঁচিয়ে, ঘণ্টার দড়িতে কসে টান লাগিয়ে, ছোটো খানসামা রান্নাবাড়ির দিকে এগুল। চলতে চলতে বই তুলে দেখে লোমহর্ষণ সিরিজ ২২ নং। মলাটের উপর দেখে গুহা থেকে মুখ বের করছে বিকট ভয়ংকর একটা কী যেন।

খাস খানসামা ছোটো খানসামার দেরি দেখে দোরগোড়া পর্যন্ত ছুটে গিয়ে দেখে গোলগোল চোখ করে কী একখানা বই পড়তে পড়তে হোঁচট খেতে খেতে সে আসছে। তার মাথায় দুই গাঁট্টা লাগিয়ে, বই কেড়ে নিয়ে, খাস খানসামা খাবার পরিবেশন করতে ছুটল।

রাজামশাই রানিমা মন্ত্রীমশাই, সুপ চপ কাটলেট স্যালাড খেয়ে বসে আছেন, খাস খানসামা আর রাজভোগ আনে না। কোনো বিপদ হল না তো, হঠাৎ কোনো শত্রু এসে রাজভোগ খেয়ে

ফেলল না তো? মন্ত্রীমশাই ব্যস্ত হয়ে পাশের ঘরে গিয়ে দেখেন রাজভোগের থালা জানলার উপর নামিয়ে রেখে খাস খানসামা কী একখানা বই পড়ছে আর তার মাথার প্রত্যেকটা চুল খাড়া হয়ে উঠেছে। রাগের চোটে মন্ত্রীমশাই ছুটে গিয়ে বই কেড়ে নিয়ে, সেটাকে পকেটে পুরে নিজেই হাতে করে রাজভোগের থালা এঘরে আনলেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর পশ্চিম দেশ থেকে সাহেবদের দূতরা এসেছে, তাদের সঙ্গে মেলা কথাবার্তা আছে। রাজামশাইয়ের বসে বসে পায়ে খিল ধরে গেল, দূতদের হেসে হেসে মুখ ব্যথা হয়ে গেল, মন্ত্রীমশাই আসেনও না, কাজের কথাও পাড়া হয় না। শেষটা আর থাকতে না পেরে রাজামশাই বেরিয়ে গিয়ে দেখেন, বারান্দার ঝাড়লণ্ঠনের তলায় দাঁড়িয়ে একহাতে কী একটা বই নিয়ে মন্ত্রীমশাই নিবিষ্ট মনে পড়ছেন, আর উত্তেজনার চোটে অন্য হাত দিয়ে মুঠোমুঠো দাড়ি ছিঁড়ে চারদিকে ছড়িয়ে ফেলছেন।

রাজা রেগে-মেগে দৌড়ে গিয়ে তাঁর হাত থেকে বই কেড়ে নিয়ে, ঘরে গিয়ে সেটার উপর চেপে বসলেন, মন্ত্রীও সুড়সুড় করে নিজের জায়গায় গিয়ে কাজের কথা পাড়লেন।

কথাবার্তা সেরে দূতরা কখন অতিথিশালায় চলে গেছে, মন্ত্রী বাড়ি গেছেন, কিন্তু রাজামশাই আর অন্দরমহলে আসেন না। শেষটা সখীরাও সবাই হাই তুলছে দেখে রানি রেগে দুমদুম করে সভাঘরে গিয়ে দেখেন, সিংহাসনে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে রাজামশাই কী একটা বই পড়ছেন, আর তাঁর ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে, কান দুটো পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠেছে। রানি রেগে অন্ধ হয়ে ছুটে গিয়ে রাজার হাত থেকে বইটা কেড়ে নিয়ে তাঁকে শুতে পাঠিয়ে দিয়ে, নিজে রাগে অভিমানে কেঁদে-কেটে গোসাঘরে গিয়ে খিল দিলেন। গোসাঘরের খাস দাসী তাঁর চুল বেঁধে দিল, রাত-কামিজ এনে দিল, বালিশটাকে আরেকটু উঁচু করে দিল, গন্ধতেলের প্রদীপটা একটু কাছে টেনে দিল। রানি তখন বালিশের তলা থেকে লোমহর্ষণ সিরিজ ২২ নং খানা বের করে দাসীকে বললেন, 'তুই আমার চুলে বিলি কেটে দিস না, পায়ের আঙুলগুলো আস্তে আস্তে টেনে দিস না, এখান থেকে ভাগ। যেখান থেকে পারিস ২৩ নং খুঁজে রাখিস। বলে বইখানি খুলে নিবিষ্ট মনে পড়তে লাগলেন, আর আস্তে-আস্তে তাঁর ভুরু কপালে উঠে যেতে লাগল, মুখ হাঁ হয়ে যেতে লাগল।*

* বিদেশি গল্প অবলম্বনে

গুপের বাহাদুরি

আমার মামাতো ভাই গুপে বলল, 'জানিস, একবার শুধু আমার জন্য আমাদের বাড়ির দশ হাজার টাকার গয়না চোরের হাত থেকে বেঁচে গেছল।' শুনে আমরা হেসেই কুটোপাটি, কারণ গুপে কুকুরকে ভয় করে, গোরুকে ভয় করে, ভূতকে ভয় করে, চোরকে ভয় করে, মাতালকে ভয় করে। গুপে রেগে বলল, 'কী? তোদের বিশ্বাস হল না বুঝি? তবে শোন্—

—'গত বছর শীতের ছুটিতে আমার মামার বাড়ি গেছি, বড়ো মামিমার মেয়ের বিয়ে। সেসব তোরা ভাবতেই পারিস না। সাতদিন আগে থাকতে রসুনচৌকি বসেছে, বড়ো বড়ো কানাত ফেলা হয়েছে, ভিয়েন বসেছে, বিয়ের আর মিষ্টির গন্ধে রাজ্যের কুকুর এসে জুটেছে। আত্মীয়স্বজনও যে যেখানে ছিল, ছেলেপুলেসুদ্ধ এসে সব জমা হয়েছে। মেজদার আবার সবে টেস্ট পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে, অঙ্কে বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি, তাই নিয়ে ওরই মধ্যে বকাবকি রাগারাগি, চিলেকোঠায় গিয়ে পড়ার ব্যবস্থা।

'বুঝতেই তো পারছিস আমার মামাবাড়ির ওরা ভীষণ বড়োলোক। খাওয়ার যা ব্যবস্থা! দুধের গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে, রুই মাছের পাহাড় জমে যাচ্ছে, আমরা খেয়ে কূল পাচ্ছি না। এমনি সময় মেজোমামা এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বউদি, গয়নাগাটি সব তোমরা একটু আগলে রেখো কিন্তু। এ অঞ্চলে ভীষণ চুরি হচ্ছে।' যেখান থেকে যত মাসি-খুড়ি এসেছিলেন সকলের হাতে এই মোটা মোটা তাগা, গলায় ভারী ভারী বিছে হার, আর বাক্সবোঝাই রং-বেরঙের পাথর-বসানো সব চুড়ি বালা কানের ঝুমকো। সবার তো মুখ প্যাঙাশপানা হয়ে গেল। যে-যার বাক্সে আরেকটা করে তালা লাগাল।

'রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর পেটে হাত বুলোতে বুলোতে মেজোমামার শালা বঙ্কুদা বেশ আসর জমকিয়ে বসে রাজ্যের চোরের গল্প বলতে আরম্ভ করল, শুনে সকলের বুক ঢিপ ঢিপ করছিল। বড়ো মামা বললেন, 'তা বাপু মন্দ বলিসনি, আজকাল ভালো মানুষের চেয়ে চোরছ্যাঁচোড়ের সংখ্যা ঢের বেশি, এমনকী, ওরা এখন পরস্পরের কাছ থেকে চুরি করতে বাধ্য হচ্ছে তো আর বলিস কেন?' আমরা তো হাঁ, সে আবার কী? বড়োমামা হেসে বললেন, 'তাও জানিস না? এই তো গেল বছর আমাদের রেলের আপিসের ছোটোসাহেব করেছে কী, সব রেজিস্টারি চিঠি-ফিটি থেকে মেলা টাকা সরিয়েছে। এখন রাখে কোথায়, ওদিকে আবার তাই নিয়ে খোঁজ-খবর ধরপাকড় চলছে, ব্যাঙ্কেও রাখা যায় না জানাজানির ভয়ে, আবার ঘরেও রাখা যায় না ধরা পড়বার ভয়ে, চোরের ভয়ে। শেষটা করল কী, টাকাগুলোকে একটা ছোটো প্যাকিং কেসে ভরে

ম্যাক্লুস্কিগঞ্জে মেমসাহেবের কাছে পার্শেল করে দিল। উপরে লিখে দিল, সাধারণ লোহার পেরেক। যখন সেখানে পৌঁছোল তখন মেমসায়েব খুলে দেখে, ওমা কী সর্বনাশ! সত্যি সত্যি পেরেক ভরতি, টাকাকড়ি হাওয়া! কী ফ্যাসাদ বল দিকিনি, না পারে পুলিশে খবর দিতে, না পারে কাগজে ছাপতে!'

'বঙ্কুদাটাকে আমরা দু-চক্ষে দেখতে পারি না, সারাক্ষণ শুধু চাল মারে, যেন কোথাকার খাঞ্জা খাঁ এলেন। এদিকে ট্যাক তো গড়ের মাঠ, কোথায় কোন ফিকিরে কার কাছ থেকে কী হাতানো যায়, সর্বদা সেই তালেই আছে! আর আমাদের পেছনে সারাক্ষণ লাগবে। বড়োমামা একটা গোটা গল্প বলে দেবেন, সে ওর সইবে কেন? অমনি বলে বসল, 'ও আর এমন কী? কথায় বলে পুকুরচুরি, তা— আমাদের ওতরপাড়ার কাছে পুকুরচুরি ঠিক না হলেও গোটা একটা বাড়ি যে চুরি হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বুঝলেন বড়দা, ওতরপাড়ার ব্যাপারই আলাদা। এই যুদ্ধের সময় একেবারে গঙ্গার ধারে বাঁশ বনের জমিদারের তিনপুরুষের পুরোনো বাড়িটা, দশ বছর খালি থাকবার পর ভাড়া হয়ে গেল। চমৎকার লোক গোপেনবাবু, ব্যাবসা করে মেলা টাকা করেছেন। বাগবাজারে জমিদারবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলে তিন বছরের জন্য বাড়ি ভাড়া নিয়ে, দেখতে দেখতে রং-টং করে জঙ্গল সাফ করিয়ে তার ভোল বদলে দিলেন। লোকটিও ভারি অমায়িক, দেখতে দেখতে পাড়ার একটি মাতব্বর হয়ে উঠলেন। স্পোর্টিং ক্লাবের প্রেসিডেন্ট, দুর্গা পুজো কমিটির পাণ্ডা, কথায় কথায় পাঁচ টাকা চাঁদা ফেলে দেন, দশ টাকার সন্দেশ-রসগোল্লা খাইয়ে দেন। গিন্নিও খাসা লোক, সকলের মুখে তাঁদের প্রশংসা ধরে না।'

গুপে এই অবধি বলতেই আমরা বললাম, 'আরে তুই কী করে গয়না বাঁচালি তাই বল-না।' রাগে গরগর করতে করতে গুপে বলল, 'আরে গোড়া থেকেই শোন-না। বুঝলি তারপর বঙ্কুদা বলতে লাগল, 'মাসকাবারে গোপেনবাবু নিজে গিয়ে বাগবাজারে ভাড়া দিয়ে আসেন। সেখানেও তাঁর ভারি খাতির। শেষে একদিন পাড়ার ক্লাবে বললেন, 'বাড়িটা কিনেই ফেললাম হে, একেবারে সের দরে ইঁট-কাঠ বেচে, নতুন করে বাড়ি ফাঁদব, কী বলেন? সবাই মহা খুশি। দেখতে দেখতে কনট্রাক্টরের সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেল। দশ হাজার টাকা দিয়ে গোপেনবাবু পোড়োবাড়ি বেচে দিলেন, চমৎকার সব পুরোনো কাঠের কড়ি বর্গা, দরজা জানলা, সস্তাই হল। কনট্রাক্টর পাড়ারই লোক, তার সঙ্গে বন্দোবস্ত হল দু-মাসের মধ্যে বাড়ি ভেঙে লোহালক্কড় ইঁট-কাঠ সরিয়ে পরিষ্কার করে দিতে হবে। ইতিমধ্যে উনি নিজে গিন্নিকে নিয়ে বদ্যিনাথে হাওয়া বদলাতে যাবেন। ফিরে এসে যা লেখাপড়া দরকার সব হবে।

'দশ হাজার টাকা নিয়ে গোপেনবাবুরা বদ্যিনাথ গেলেন। ইতিমধ্যে কনট্রাক্টর বাড়ি চেঁছেপুছে নিয়ে গেল। এমনি সময় একদিন স্বয়ং জমিদারবাবু হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির। কী সর্বনাশ, বাড়ি কোথায় গেল? আর বাড়ি কোত্থেকে আসবে? গোপেনবাবুও একেবারে নিখোঁজ।'

'বঙ্কুদা গল্প শেষ করে একটিপ নস্যি নিল। এমন সময় মামাদের সরকার মশাই বড়ো একটা লাল শালুর পুঁটলি এনে বড়োমামার কোলে ফেলে দিয়ে বললেন, 'ধরুন, সিন্দুকে তুলুন, এর মধ্যে দশ হাজার টাকার গয়না আছে।' বড়োমামা ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'ওমা, তাই তো! এই গুপে, যা তো বাবা এই পুঁটলিটা তোর বড়োমামিমাকে দিয়ে আয়, এখনই সিন্দুকে তুলে ফেলুক।' গেলাম ছুটে। বড়োমামিমা ছোটোখুকিকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে নিজেই অর্ধেক ঘুমুচ্ছেন। সিন্দুকের চাবি আমাকে দিয়ে বললেন, 'তুমি তো বাবা সিন্দুক খুলতে জান, তুলেই রাখো-না লক্ষ্মীসোনা!'

'পরদিন সকালে মহা হইচই! ওই অত বড়ো লোহার সিন্দুক, রাতারাতি তাকে কে খুলে ফেলেছে, দরজা হাঁ হয়ে রয়েছে, ভিতরে খালি! কান্নাকাটি, রাগারাগি লেগে গেল। বড়োমামা পুলিশে খবর দিতে যাবেন বলে চটি পায়ে দিচ্ছেন, বঙ্কুদা, ছোটোমামা সবাই চেঁচামেচি করছেন; এমনি সময় আমি গুটিগুটি গিয়ে বড়োমামার হাতে লাল শালুর পুঁটলি ও সিন্দুকের চাবিগাছি দিলাম।

—'অ্যাঁ, এ কোথায় পেলি?'

—'ইয়ে— ওটাকে আমার লেপের মধ্যে নিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কিনা।' বড়োমামিমা দরজার কাছ থেকে বললেন, 'সে কী রে, সিন্দুকে তুলিসনি নাকি?...'

'আমি কিছু বলবার আগেই, বড়ো খুকিটা এমনি পাজি, বলে উঠল, 'হ্যাঁ, ও একা একা গিয়ে সিন্দুকে তুলল আর কী! ভূতের ভয় নেই?' বড়োমামা-টামা সবাই হো হো করে হাসতে লাগলেন। শুধু বঙ্কুদা চাপা গলায় বলল, 'ইডিয়ট! কোনো কিছুর জন্য যদি নির্ভর করা যায়! স্টুপিড কোথাকার!'

পালোয়ান

নিউ মার্কেটের পিছনে বাঁদরের দোকান আছে। ছোটো ছোটো খাঁচায় পোরা বাঁদরের ভিড়, এ-ওর গায়ে চিপকে রয়েছে। তা ছাড়া সাদা ইঁদুর, বেজি, কাকাতুয়া, কালোমুখো ল্যাজ-প্যাঁচানো শ্যামদেশের বেড়াল, ভালুকবাচ্চা, আরো কত কী যে পাওয়া যায়! চারদিকে একটা সোঁদা সোঁদা চীনাবাদাম— পাকা কলা— বাঘ বাঘ— গন্ধ।

সেখানে প্রায়ই যেতাম। হাঁ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকতাম। কিনবার তো আর উপায় ছিল না। টিপিনের পয়সা জমিয়ে গোটা-দুই সাদা ইঁদুর যে কিনতে পারতাম না তা নয়। তবে পিসিমা, বড়ো জেঠিমা, মা এরা সব তাহলে কী কাণ্ডটাই যে করবেন সে আমার বেশ জানা ছিল। শেষটা বাবা বাধ্য হয়েই বলবেন, 'জগা! যেখান থেকে এনেছিলি সেইখানে দিয়ে আয়।' এই ভয়েই কিছু করতে পারছিলাম না।

ওইখানেই একদিন পালোয়ানটার সঙ্গে দেখা হল। ইয়া বুকের ছাতি। দেখতে যেন একটা বিরাট পিপে। কোথায় যে ঘাড় শেষ হয়েছে, কোথায় যে বুক, কোথায় যে ভুঁড়ি শুরু হয়েছে, কিছুই বাবা বোঝা যায় না। আমাকে দেখে গুম গুম করে নিজের বুকে কিল মেরে বলল, 'কী রে মুরগি! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাঁদরবাচ্চা দেখছিস? এই আমার মতো আধসের করে দাঁত দিয়ে খোলা ভেঙে বাদাম খাবি, আর পাঁচ-শো বার ডন-বৈঠক করবি।' এই বলে সে সেইখানেই দু-চারবার ওঠ-বোস করে দেখিয়ে দিল। বাঁদরগুলো তো তার কাণ্ড দেখে এ-ওর পিঠে মুখ লুকিয়ে হেসেই একাকার!

লোকটি আমার কাছে এসে দুই আঙুল দিয়ে আমার বাইসেপ টিপে হ্যা হ্যা করে হেসে বললে, 'কী খাও হে? গোলাপজল দিয়ে মাখনতোলা দুধ বুঝি? ছি, ছি, লজ্জাও করে না? ওইরকম শরীর দিয়ে দেশরক্ষা করবি কী করে? জানিস ভীমভবানী দিস্তে-দিস্তে মোটা মোটা লাল আটার রুটি, গাওয়া ঘি আর অড়র ডাল দিয়ে খেয়ে দুটো দু-মনি মুগুর নিয়ে দু-ঘণ্টা ভাঁজতেন।'

ততক্ষণে বেশ একটা ছোটোখাটো ভিড় দাঁড়িয়ে গেছে। 'আমি কে, তা জানিস? আমি ওই ভীমভবানীর নাতি। জানিস আমার দাদামশাই স্যান্ডোর শিষ্য ছিলেন। তাঁর পায়ের গুলিতে মোটা মোটা লোহার ডান্ডা মেরে বেঁকিয়ে বিনুনি বানিয়ে ফেলা হত।'

আবার বুক চাপড়ে লোকটা বলল, 'আর সেই আমি কি না তোদের মতো গঙ্গাফড়িংদের সঙ্গে সময় নষ্ট করি!' বলে লোকটা চলে গেল।

তারপর আরও অনেক বার দেখা হয়েছে। সর্বদা একই ড্রেস। খাকি হাতকাটা মিলিটারি শার্ট, খাকি হাফপ্যান্ট, পায়ে ব্রাউন ক্যাম্বিসের জুতো। ছোট্ট ছোট্ট করে চুল ছাঁটা, খোঁচা খোঁচা দাঁতের বুরুশের মতো গোঁফ।

কত কী যে বলত তার ঠিক নেই।

—'আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাঁদর দেখছিস? জানিস, আমার বাবা বিখ্যাত বাঘশিকারি ছিলেন। এমনি তাঁর সাহস ছিল যে মাচাফাচা বাঁধতেন না, কত সময় বন্দুক নিয়ে যেতে পর্যন্ত ভুলে যেতেন। এমনি করে বাঘের ল্যাজ ধরে বাঁই বাঁই করে বার-কুড়িক চারদিকে ঘুরিয়ে দিতেন ছেড়ে। পঞ্চাশ গজ দূরে ব্যাঘ্রমশাই পড়ে একেবারে ইহলীলা সংবরণ।'

মাঝে মাঝে হঠাৎ আমার দিকে ফিরে, চোখ-টোখ পাকিয়ে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করত

—'কী? বিশ্বাস হল না বুঝি? তবে চল ব্যাটা আমার পিসেমশাইয়ের কুস্তির আখড়ায় নিয়ে যাই, আমার দু-চার প্যাঁচ শিরমোড়া দাড়িমোড়া না খেলে দেখছি তোদের বিশ্বাস হবে না। কেমন, যাবি কি না?' বলে খপ করে কুলোর মতো দুই হাত দিয়ে আমার ঘাড় ধরে টান! ব্যস্ত হয়ে বলি, 'আরে না, না। আপনি যা যা বলেন আমি ভীষণ বিশ্বাস করি।' তক্ষুনি খুশি হয়ে গিয়ে আরও বলতে থাকে

—'দেশে আমাদের বাড়ির বাগানে বুনো হাতি ছাড়া থাকে, লোকের বাড়িতে যেমন হরিণ-টরিন থাকে। সকালে-বিকেলে যখন-তখন আমার ভাইরা এক হাত দিয়ে বুনো হাতির এক হাঁটু ধরে ঠেলতে ঠেলতে তাদের মাটিতে বসিয়ে দেয়।' মাথা নীচু করে একটু লজ্জার সঙ্গে হাসে আর বলে, 'বুঝলি, ভগবানের ইচ্ছেয় পয়সাকড়ির আমাদের অভাব নেই। ঠাকুরদার ঠাকুরদার সময় থেকে সোনা-রুপোর পাহাড় জমছে তো জমছেই। এখন আর ওজন-টোজনও করা হয় না, গুদোম ঘরে অমনি পড়ে পড়ে থাকে আর ধুলো জমে। আমাদের বাড়ির মেয়েদের পর্যন্ত কী ভয়ংকর জোর! একবার আমার মা আর ঠাকুমা খুস্তির বাড়ি দিয়ে একদল ডাকাত স্রেফ ঠেঙিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তখনকার সাহেব বড়োলাট সেইজন্য তাঁদের হিন্দি ভাষায় চিঠি লিখেছিলেন। তাঁরা অবিশ্যি মানে বুঝতে না পেরে সে চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।'

এই অবধি বলে আমার দিকে ফিরে বললে, 'হাসছিস যে? বলি, লেখাপড়া শিখে তোর কী সুবিধেটাই হচ্ছে বল-না? দেখতে তো ওই ভিজে বেড়ালটি, সাত চড়েও তো মুখে রা নেই, করবি তো কেরানিগিরি কি পোস্টমাস্টারি। আর আমাকে দেখ, যুক্তাক্ষর পড়তে পারি না, ইচ্ছে করে শিখিনি, আর আমাদের গুদোম ঘরে যে ঢুকবে তাকে মণিমুক্তো মাড়িয়ে মাড়িয়ে ঢুকতে হবে। যাই, সন্ধ্যে হয়ে এল, ডন-বৈঠকের সময় হল।'

আরেক দিন অনেক নতুন পাখি এসেছে, লাল নীল সবুজ সব তোতাপাখি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখছি হঠাৎ লোকটা এসে তাই দেখে হেসেই কুটোপাটি, 'ও কী রে! তার চেয়ে খাটে শুয়ে শুয়ে টুনটুনি পাখির ছবি দেখলেই পারিস! আমার বাবার কাকাবাবু হিমালয় থেকে ইগল পাখি ধরে এনে টিরেটি বাজারে বিক্রি করতেন। ডানা মেললে তাদের এদিক থেকে ওদিক বারো ফুট, তা জানিস? সেগুলোর দুই পা এক হাতে মুঠো করে ধরে আর অন্য হাতে বাঁকানো ঠোঁট দুটো একসঙ্গে চেপে ধরে গঙ্গার ধারে হেঁটে হাওয়া খেতে যেতেন। তোরা আর আমাকে হাসাসনি।'

যেমনি লোকটার গুষ্টিসুদ্ধ সকলের গায়ে জোর, তেমনি তাদের মনে সাহস। একদিন সে বললে, 'কী বলাবলি করছিল ওরা? দোকানদারের শত্রুরা এসে বাঁদরকে আফিং খাইয়ে দিতে চেষ্টা করছিল? হেসে বাঁচিনে! আরে পুরুষ মানুষের মতো যে পুরুষ মানুষ তার শত্রু থাকবে

কেন? আমার বুড়ো ঠাকুরদা হয় স্রেফ পিটুনি দিয়ে সব বন্ধু বানিয়ে ফেলতেন, নয়তো যারা তবু বন্ধু হতে রাজি হত না তারা রাতারাতি কোথায় যে উড়ে যেতো তার ঠিক নেই, একদম নিখোঁজ!! পুরুষ মামুষের আবার শত্রু কী রে? আমার একজনও শত্রু নেই।' বলে কটমট করে সকলের দিকে তাকাল। আমরা সকলেই হেঁ হেঁ করে হাসতে লাগলাম। আমরা তো তার বন্ধু লোক।

একদিন বিকেলে বাঁদরের দোকানে গিয়েছি। বাঁদরওয়ালা বলল, 'একটা কুকুরবাচ্চা দেখবে খোকাবাবু? এক জন দিয়ে গেছে, ভারি সস্তা দাম। এমন সময় লোকটি এসে বললে, 'কী!' কুকুর রাখ নাকি তোমরা? এখানকার সব কুকুর দেখলে আমার হাসি পায়। আমাদের বাড়ির উঠোনে ডালকুত্তা ছাড়া থাকে। গলায় একটি কলার পর্যন্ত থাকে না। চোর বাছাধন সোনাদানার লোভে যে কখনো ঢোকেন না তা নয়। কিন্তু পরদিন সকালে এক-আধটা লেংটির সুতো, কী হাফপ্যান্টের বোতাম ছাড়া কিচ্ছু কখনো দেয়া যায়নি।'

তারপর দোকানের রোয়াকের উপর পা ঝুলিয়ে বসে বলল, 'উঃ! পা-টাতে একটু ব্যথা হয়েছে; কাল রাতে হেঁটে বর্ধমান ঘুরে এলাম কি না! তা কিনা বলছিলাম, ও হ্যাঁ, ওই বর্ধমানে আমার মাসির বাড়িতে এমন সব কুকুর আছে, যা দেখলে শুধু মেসোমশাইকে কেন মাসিমাকে পর্যন্ত পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে। সেগুলোকে এক বার দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না যে, ওরা শুধু সাধারণ গোরু-ভেড়ার হাড় খেয়ে মানুষ। আরে আমি নিজেই তো একবার একদল ব্লাড্‌হাউন্ড— ও কি ওটা আবার কী নিয়ে এল'— এই বলে তড়াক করে লোকটা লাফিয়ে বারান্দা ছেড়ে একেবারে ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়াল। দোকানদার অত বুঝতে না পেরে, কালো কুচকুচে মিষ্টি ভুটে কুকুরের বাচ্চাটাকে তুলে ধরে একেবারে তার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। দেখলাম লোকটার দুই চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, তার চুল আর গোঁফ খাড়া খাড়া হয়ে উঠেছে।

কুকুরবাচ্চা খুদে ল্যাজটা নেড়ে লাল ছোট্ট একটা জিভ বের করে লোকটার গালে অল্প একটু চেটে দিল। অমনি কীরকম একটা শব্দ করে লোকটা সেখানেই মুচ্ছো গেল। দোকানদার বিরক্ত হয়ে বললে, 'মোটর কোম্পানির সব দরওয়ানগুলোই ওইরকম, খালি বসে বসে খাবে, আর ছুঁলেই অজ্ঞান। থাক ব্যাটা পড়ে।'

এই দেখো আমি এক টাকা দিয়ে কুকুরবাচ্চাটাকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি। যে যাই বলুক, আমি কিছুতেই ওকে ছাড়ব না। পুজোর সময় সবাই সবাইকে জিনিস দেয়, আমিও নিজেকে কুকুরবাচ্চা দিলাম। জান, আমার ঠাকুরদাদা একবার— আচ্ছা, আচ্ছা, থাকগে।

আমাদের দেশে

আমাদের দেশের কথা আর কী বলব, সেকি আর এখন আমাদের আছে? একেবারে পাকিস্তানের পুব কোণে ঠুসে দিয়েছে। কিন্তু সেখানকার লাল লাল গোল-আলু আর সেখানকার পাকা সোনালি আনারস আর আঠালো দুধের ক্ষীর যে একবার খেয়েছে সে সারাটা জীবন শুধু কী খেলুম কী খেলুম বলে হা-হুতাশ করে কাটাবে!

তা ছাড়া সেখানকার বাঘের যা উপদ্রব ছিল সে আর ভাবা যায় না। অনেক দিন আগের কথা বলছি, রাত হলেই যখন-তখন গাঁয়ের মধ্যে বিরাট বিরাট বাঘ এসে ঘুরে বেড়াত, আর যে-যেখানে থাকত সামনে যার বাড়ি পেত সেখানেই কপাট দিয়ে, চিৎকার করে নিজের বাড়িতে খবর দিত, 'শুনছো নি? আইজ আর বারি যাইতাম না, তোমরা হগলতান খাইয়া-দাইয়া হুইয়া পরো।' বাঁশ-চেরা সব গলাও ছিল, আধ মাইল দূর থেকে শোনা যেত। খেত কী! দুধ, ঘি আর তাল তাল ভাত।

শুনেছি আমাদের বুড়ো চাকর যামিনীদার শ্বশুর শিবু একবার ওইরকম বন্ধুর বাড়িতে আটকা পড়েছে। বাইরে বাঘ হালুম-হুলুম করে বেড়াচ্ছে, তার দাপানির চোটে বাড়িঘর কাঁপছে। এমনসময় শিবুর বন্ধু বলল, 'উয়ারে খেদাইয়া নদী পার করতে পারস ত তরে ওই সবরি কলার কান্দিটাই দিবাম।' শিবুও তেমনি লাফিয়ে উঠে বলে, 'তাই দিবাম, এক্ষ্যারে নদী পার করাইতাম।'

এই-না বলে ঘরের কোণ থেকে বাঁশগাছটা নিয়ে তার আগাটা হাত খানেক দা দিয়ে চিড়ে নিল। তারপর হঠাৎ সেটা মাটিতে ঠুকে একটা বিকট হা রে রে রে শব্দ করে, দরজা খুলে ছুটে বাইরে বেরুল। বাঘ-না তাই শুনে অ্যাক্কারে ল্যাজ তুলে পগার পার। শিবুও সেইরকম চেরা বাঁশের শব্দ আর হা রে রে রে চিৎকার করতে করতে সত্যি সত্যি তাকে নদী পার করে দিয়ে এল।

পার করে দিয়ে শিবুর তো ভারি ফুর্তি হল, এবার ক্যায়সা কলার কাঁদিটা কাঁধে নিয়ে বাড়ি যাওয়া যাবে! ফুর্তির চোটে গলা দিয়ে গান বেরিয়ে গেল, বাঁশগাছা কাঁধে ফেলে গান গাইতে গাইতে শিবু বাড়িমুখো চলেছে। ওদিকে বাঘও নদীর ওপার থেকে গান শুনে বুঝল, তবে এ তো মানুষ, ভয় পাবার কিছু নয়! এই-না ভেবে জোড় পায়ে লাফাতে লাফাতে শিবুর পিছনে ছুটল, আর শিবুও 'ও বাবারে মারে গেছিরে, ধরেছে রে,' বলে পাঁই পাঁই ছুটেছে। কোনোরকমে সামনে যে বাড়ি ছিল তার মধ্যে ঢুকে পড়েছে, পাঁচজনে মিলে ঠেলে-ঠুলে দরজায় খিল দিয়েছে, আর বাঘও ওদিক থেকে দরজার উপর লাফিয়ে পড়েছে।

এইরকম ব্যাপার মাঝে মাঝেই হত। আসল কথা হল, শিবু ভীষণ ভাং খেত। তাই নিয়ে শিবুর বউ দিনরাত খেঁচাখেঁচিও করত, কিন্তু কোনো ফল হত না।

একদিন শীত কালে সন্ধ্যে বেলা শিবু তো নেশায় বুঁদ হয়ে ঘরের মধ্যে ঝিমুচ্ছে, এমন সময় বউ এসে বলল, 'আবার ঝিমুচ্ছো? তেঁতুল গাছতলা থেকে নতুন বাছুরটাকে ঘরে এনে তুলেছ?'

তাই তো! নেশার ঘোরেও শিবু টের পেল কাজটা ভালো হয়নি। বাছুর তো সেই দুপুর থেকে তেঁতুলতলায় বাঁধাই আছে, যদি বাঘে নেয়! তড়াক করে লাফিয়ে উঠে, অন্ধকারের মধ্যেই শিবু তেঁতুলতলায় গিয়ে হাতড়ে হাতড়ে বাছুর তুলে কোলপাঁজা করে ধরে ঘরের দিকে চলল। দরজার সামনে আসতেই ভিতর থেকে প্রদীপের আলো একটু একটু বাছুরটার গায়ে পড়তেই শিবু অবাক হয়ে দেখে, বাছুরটার সারা গায়ে ডোরা ডারা দাগ, এমনকী শিবুর হাতের উপর দিয়ে যে ল্যাজটা ঝুলে রয়েছে তাতে পর্যন্ত আগাগোড়া ডোরা কাটা! দারুণ চমকে গিয়ে শিবু জন্তুটাকে দুম্ করে মাটিতে নামিয়ে দিতেই সেটা গাঁক করে একটা ডাক ছেড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দে ছুট। আর শিবুও ঢুলতে ঢুলতে তেঁতুলতলায় ফিরে গিয়ে এবার সত্যি সত্যি বাছুরটিকে কোলে নিয়ে, ঘরে এনে দরজা বন্ধ করে, আবার তক্তপোশে বসে বসে ঢুলতে লাগল।

নেশার ঘোরে বউকে কিছু বলাই হল না।

পরদিন সকালে নেশা ছুটে গেলে তার সারা গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল, 'অ্যাঁ, কও কী! তবে কি বাছুর ভ্যাইব্যা বাঘটারেই কোলে করছিলাম নাকি?'

বাঘের উপদ্রব আমাদের গ্রামে লেগেই ছিল। একদিন আমার বাবার এক ঠানদিদি বাগান থেকে ডাব পাড়িয়েছেন, তারই গোটাদুইকে যেমন একটুখানি খোসা ছিলে নিয়ে একসঙ্গে বেঁধে দেয় ওইরকম করে হাতে ঝুলিয়ে বাড়ির উঠোনে এসে পা দিয়েছেন, এমন সময় তাঁদের বাড়ির চাকর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে খবর দিল যে পুকুরপাড়ে ঠানদিদির বুধি গাইকে বাঘে ধরেছে। ঠানদিদি তো চটে লাল! ব্যাটা তুই কোন আক্কেলে বেচারা গাইকে বাঘের মুখে ছেড়ে দিলি! আর বাঘ হতভাগারও তো কম আস্পর্ধা নয় যে ঠানদিদির গাই ধরে!

হন হন করে ডাব দোলাতে দোলাতে ঠানদিদি একেবারে পুকুরপাড়ে গিয়ে হাজির। একদিকে বুধি শিং বাগিয়ে বাঘের সামনে দাঁড়িয়েছে, আর ঠানদিদিও একদৌড়ে, 'তবে রে পাজি!' বলে বাঘের মাথায় দিয়েছেন কষিয়ে ডবল ডাবের বাড়ি। বাড়ি খেয়ে বাঘ বিকট আর্তনাদ করে উঠেছে, আর আশেপাশে থেকে বিশ-পঁচিশ জন লোক মোটাসোটা লাঠি নিয়ে দৌড়ে এসে দেখতে দেখতে বাঘের দফা শেষ।

এইরকম সব ছিল আমাদের দেশের লোকেরা সেকালে। এখন সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই।

নটেমামা

আমি জন্মাবার অনেকদিন আগে মেজোমামা যখন ইস্কুলে পড়তেন, একবার পুজোর ছুটিতে কাঁচকলা নিয়ে দেশে গেছেন, আর তার পরের দিনই ভোরে মার নটেমামা তাঁর বিখ্যাত কালো সুটকেস নিয়ে উপস্থিত হলেন। রং-ওঠা দেড় হাত লম্বা একটা পুরোনো কালো সুটকেস, তাতে ডবল তালা মারা।

ওই সুটকেসই তিরিশ বছর ধরে মামাবাড়ির ইতিহাস তৈরি করল।

নটেমামাকে দেখেই দিদিমা নাকি কোল থেকে দুম করে ছোটোমাসিকে নামিয়ে রেখে, 'ওরে নটে অ্যাদ্দিন তুই কোথায় ছিলি রে, ওরে বাবা রে!' বলে তাঁর গলা ধরে ঝুলে পড়লেন।

নটেমামা বললেন, 'আঃ কী যে কর দিদি! সুটকেস পড়ে গেলেই সর্বনাশ হবে। মনে করেছি তোমার ছেলেপুলেদের দিয়ে যাব! আর কারুর কোনো অভাব থাকবে না।'

তাই শুনে দিদিমা তখুনি গলা ছেড়ে দিয়ে, চোখ মুছে একগাল হেসে বললেন, 'ওমা! তুই চিরটা কালই পেজোমি করে কাটালি! তুই আবার ওতে ভরে কী আনলি?'

নটেমামা বললেন, 'সময় হলে সবই জানতে পারবে দিদি! তোমার ছেলেপুলেদের ছাড়া ও আর কাকে দিয়ে যাব!'

দিদিমার পেছন দিক থেকে দরজা দিয়ে জানলা দিয়ে পিলপিল করে বেরিয়ে এসে মেজোমামা সেজোমামা বড়োমাসি বড়োমেসো প্যাঙাদা ভজাদা রাঙামাসি ঢ্যাঙামাসি টেঁপিদিদি খেঁদিদিদি ইত্যাদি আর পাঁচ-সাতজন কারু ঝুঁটি বাঁধা, কারু কোমরে কালো সুতোয় পয়সা বাঁধা, কারু ন্যাড়া মাথা, যে যেমন ছিল, সবাই অবাক হয়ে শুনল।

তারপর নটেমামা বারান্দার কোণে তালি-দেওয়া কালো ছাতাটা রেখে মাঝের ঘরের তক্তপোশে পা ঝুলিয়ে বসলে পরে, সবাই এগিয়ে এসে ওঁর ছেঁড়া নোংরা সাদা ক্যাম্বিশের জুতোপরা পায়ে ঢিপ ঢিপ করে প্রণাম করল। আর নটেমামা সবাইকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'সুটকেসে তোদের সবার ভাগ আছে। কারু কোনো দুঃখু থাকবে না।' তখন দিদিমা সবাইকে তাড়িয়ে দিলেন; বললেন, 'আহা মানুষটা রোজগারপাতি করে তেতে-পুড়ে এয়েছে। তোরা যেন কী!' বলে নটেমামার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'তোকে ওদের বড্ড ভালো লেগেছে রে, রক্তের টান, ফোঁৎ ফোঁৎ!' বলে আবার চোখ মুছে নটেমামাকে স্নান করবার গরম জল, নরম তোয়ালে, সুগন্ধ সাবান, সেন্টেড নারকোল তেল, দাদামশায়ের সবথেকে ভালো চটি জোড়া আর নতুন ধুতি দিলেন।

তারপর রেকাবি করে সরভাজা আর ভালো সন্দেশ আর হলদে পেয়ালাতে গরম চা দিলেন। শেষে রান্নাঘরে গিয়ে মহা চ্যাঁচামেচি লাগিয়ে দিলেন। মার নটেমামা এদিকে তক্তপোশে পা মেলে, বালিশে ঠেসান দিয়ে, খবরের কাগজ নিয়ে শুয়ে পড়লেন।

দিদিমা একবার এসে বলে গেলেন, 'ওরে নটে, আমি আর কোনো আপত্তি শুনব না। বাকি জীবনটা তোকে এখানেই কাটাতে হবে। অ খেঁদি, অ খেপি, তোদের কি কোনো আক্কেল নেই লা? নটেদাদামণির পাদুটো একটু টিপেও দিতে পারিস-না? সুটকেসের ভাগ নিতে তোদের লজ্জা করবে না?'

খেঁদি খেপি ইয়া বড়ো বড়ো সাদা সাদা জিভ কেটে তক্ষুনি পা টিপতে লেগে গেল। আর রাঙামাসিও পেছুপাও না হয়ে তামাক সেজে দিল। তারপর দুপুরে মুড়িঘণ্ট, মাছভাজা, নারকোল-চিংড়ি, দই, রাজভোগ ইত্যাদি খেয়ে নটেমামা দাদামশায়ের খাটে শুয়ে পড়লেন। বড়োমামিমা সারাদিন বসে বসে বুড়োকে হাওয়া করলেন। আর দাদামশাই বেচারা কিঞ্চিৎ উস্‌খুস্‌ করে শেষে পুরোনো চটি জোড়াই পায়ে দিয়ে নকুড় দাদামশাইদের বাড়ি তাস খেলতে গেলেন।

সেই প্রথমবার এসে মার নটেমামা আট মাস পরম আরামে কাটিয়ে গেলেন। এই আট মাস দাদামশাই মাছের মুড়ো কী পেটির বনো চাকলা কী মাংসের চোঙার হাড়, কী বড়ো ফলটা-মিষ্টিটার মুখ দেখলেন না। দিদিমা আগেই সেসব নটেমামার পাতে তুলে দেন।

ছুটির শেষে মেজোমামা যেদিন রওনা হবেন সেদিনও দেখলেন নটেমামা মোড়ায় পা উঠিয়ে দাদামশাইয়ের ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে পান চিবোচ্ছেন আর রাঙামাসি মাছি তাড়াচ্ছে, বড়োমাসি পাকা চুল তুলছে।

কলকাতা গিয়েও রেহাই নেই। থেকে থেকেই দিদিমার ফরমাস আসতে লাগল নটের জন্য বালাপোশ, নটের জন্য এগারো ইঞ্চি গরম মোজা, নটের জন্য ইত্যাদি।

পরের বছর আবার পুজোর ছুটিতে বাড়ি গিয়ে মেজোমামা দেখলেন নটেমামা ইতিমধ্যে একদিন বাড়িসুদ্ধ সবাইকে কাঁদিয়ে শ্বশুরবাড়ি গেছেন। শুনলেন দিদিমা নাকি অনেক করে বলেছিলেন, 'ওরে আমার বুকটাকে একেবারে খাঁ খাঁ করে দিয়ে যাস নে রে। নিতান্তই যদি যাবি, নিদেন তোর সুটকেসখানাও রেখে যা।'

নটেমামা অবাক হয়ে গিয়ে বলেছিলেন, 'আঃ কী যে বল দিদি! ওই সুটকেসেই তো আমার সব! আমি আর ক-দিন! তোমার ছেলেপুলেরাই পাবে!' বলে নতুন কালো জুতো, আদ্যির পাঞ্জাবি, তসরের চাদর আর সোনা-বাঁধানো ছড়ি নিয়ে ছ্যাকড়া গাড়ি চেপে চলে গেলেন। নটেমামার চেঞ্জ ছিল না বলে দিদিমা আবার যাবার খরচটা আর আবার ফিরে আসবার খরচটা দিয়ে দিলেন।

মেজোমামা দেখলেন নটেমামার জন্য মাঝের ঘরটাকে রেডি করে তালা দিয়ে রাখা রয়েছে। রোজ ধুলো ঝাড়া এবং ধুনো দেওয়া হচ্ছে। সকলেরই প্রায় মন খারাপ। খালি দাদামশায়ের মুখে হাসি। দিদিমা তো থেকে থেকেই বলেন, 'আহা যদি সুটকেসটাও রেখে যেত তাতে হাত বুলোতাম। কী জানি বাবা, শ্বশুরবাড়ির ওরা যদি আবার তুকতাক করে নেয়!'

সেবার পুজো দেরিতে পড়েছিল, মেজোমামা যখন ফিরে আসবেন তখন বেশ শীত পড়ে গেছে। শেষ দিনেই আবার নটেমামা ছেঁড়া কোট ছেঁড়া জুতো আর কালো সুটকেস নিয়ে এসে

উপস্থিত। বললেন দিদিমার-দেওয়া সব জিনিস চুরি গেছে। কিন্তু দিদিমার ছেলেপুলেদের জন্য সুটকেসটা প্রাণ দিয়ে রক্ষা করে এনেছেন।

তাই শুনে দিদিমা ডুকরে কেঁদে উঠলেন। পরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছিল?' নটেমামা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'থাক, সেকথা আর মুখেও আনতে বোলো না।' দিদিমা ভাবলেন, সব ওই মুখপোড়া শ্বশুরবাড়ির কাণ্ড এবং তখুনি নটেমামার জন্য নতুন জুতো নতুন ছড়ি থেকে আরম্ভ করে নতুন বালাপোশ নতুন কম্বলের ব্যবস্থা করে দিলেন। এই আয়োজনের মধ্যে মেজোমামার ট্রেনের সময় হয়ে যাওয়াতে, মেজোমামা না খেয়েই রওনা হয়ে গেলেন, কেউ খেয়ালও করল না।

তার পর থেকে পঁচিশ বছর ধরে মার নটেমামা বছরে এক বার করে সুটকেস হাতে আসেন, আট-ন মাস থেকে আবার 'শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি' বলে কোথায় জানি চলে যান। প্রতিবছর চোররা অনলসভাবে ওঁর সর্বস্ব চুরি করে নেয় আর দিদিমাও তেমনি অনলসভাবে আবার সমস্ত কিনে দেন। দাদামশাইও শেষ অবধি আপত্তি করা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

পঁচিশ বছর পরে দিদিমা ও দাদামশাই চোখ বুজলেন। নটেমামা তখন শ্বশুরবাড়িতে, সেই ঠিকানাতে তার করা হল, পেলেন কি না বোঝা গেল না। মোটকথা এলেন না।

পুজোর সময় আবার যখন কাপড়চোপড় কেনা হচ্ছে, নটেমামা কালো সুটকেস হাতে উপস্থিত। বললেন, 'আর ইয়ে শ্বশুরবাড়ি যাব না। এখন থেকে আমিই তোদের গার্জিয়ান হলাম।' বলে সেদিন থেকেই সবকিছু হুকুম দেওয়ার ভার নিলেন।

বড়োমামা মেজোমামা তখন বিদেশে চাকরি করেন আর মাসে মাসে টাকা পাঠান। সেই টাকার বেশিরভাগটা দিয়ে বড়োমামি মেজোমামি রেষারেষি করে নটেমামার সেবা করেন। নটেমামা দিব্যি আরামে আছেন। কাজের মধ্যে মাঝে মাঝে দরজা-জানলা বন্ধ করে সুটকেস গোছান। আর যেদিনই গোছান সেদিনই মেজাজটা যেন আরও ভালো থাকে।

সবাইকে বলেন, 'দিদিরা গেছেন, আমারই-বা আর ক-দিন! তোদের অনেক সেবা নিয়েছি, দেখিস আমাকে যেন ঝগড়াঝাঁটির কারণ বানাস না! সুটকেসে যথেষ্ট আছে। সবাই সমান ভাগে ভাগ করে নেবার জন্য যথেষ্ট আছে! এতদিন রইলাম, কাউকে কিছু ইচ্ছে করেই দিইনি যাতে আমি গেলে তোদের জন্য আরও বেশি থাকে। নিজের জন্যও এক পয়সা খরচ করিনি। তোরা যখন যা দিয়েছিস তাতেই আমার চলে গেছে।'

তাই-না শুনে বড়োমামিমা আর মেজোমামিমা ঠিক দিদিমার মতন করে ফোঁৎ ফোঁৎ করে কেঁদে চোখে আঁচল দিলেন, এ আমার নিজের চোখে দেখা।

আজকাল মার নটেমামা বুড়ো হয়ে গেছেন, শ্বশুরবাড়ি যাওয়াও ছেড়ে দিয়েছেন। সুতির কাপড় পরলে গা কুটকুট করে বলে গরদ ছাড়া কিছু পরেন না। এমনি তেল-ঘি সহ্য হয় না বলে গাওয়া ঘিতে ওঁর সব রান্না হয়, রাত্রে গাওয়া ঘি দিয়ে লুচি হয়। দুর্বল হয়ে গেছেন বলে রোজই কী বলে— ইয়ে মুরগি হয়। ছাঁচি পান আসে, অম্বুরি তামাক আসে।

থেকে থেকে নটেমামা সবাইকে ডেকে বলেন, 'ওরে আমি গেলে তোরা ঝগড়া করিস না রে, প্রচুর আছে, প্রচুর আছে।'

আমরা হিসেব করে দেখেছি দিদিমা দাদামশাইয়ের সঙ্গেসঙ্গেই যদি নটেমামা স্বর্গে যেতেন, একদিক দিয়ে ভালোই হত। ওঁরও সব জ্বালা জুড়োত, আর সুটকেসও মোটে একুশ ভাগ হত। এই পাঁচ বছরে আরও সবাই জন্মে-টন্মে একাকার কাণ্ড করেছে। এখন বেয়াল্লিশ ভাগ হবে।

আমরা মনে করে রেখেছি সুটকেসে হিরে মণি-মুক্তো আছে। মনে করেছি বোধ হয় তোড়া তোড়া হাজার টাকার নোট ঠাসা, তাই গোপনে সুটকেস নেড়ে দেখেছি ভেতরে কিছু নড়ে না। বেশ হালকাও।

যাই হোক, গত বছরের শেষে একদিন সন্ধ্যে বেলা নটেমামা সত্যি সত্যি পটোল তুললেন, বাইরে ঝমঝম বৃষ্টি, ঘরে তেলের বাতির আলোতে নটেমামা মলেন।

মামিমারা হু হু করে একবার কেঁদে নিয়েই সুটকেসটাকে টেনে বারান্দায় আনলেন। নটেমামার বালিশের তলা থেকে চাবি বের করলেন। দেশলাইয়ের আলোতে খুললেন।

খুলে দেখলেন শুধু খড় ঠাসা। না, শুধু খড় নয়, তার উপর একটা কাগজে লাল পেনসিল দিয়ে লেখা :

'কাউকে কভু লাই দিস নে,
করিস নে কো বিশ্বাস।
বুদ্ধি তোদের দেখে দেখে
নটে ফেলছে নিশ্বাস!'

হারানো জিনিস

ভেবেই পেলাম না আংটিটা গেল কোথায়। খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেলাম। অথচ ব্যাপারটা বলাও যায় না কাউকে। মাসি ওটাকে স্নানের ঘরে তাকের উপর ভুলে ফেলে এসেছিল। স্রেফ ওকে একটা শিক্ষা দেবার জন্য আমি ওটাকে নিয়ে পকেটে রেখে দিয়েছিলাম। তারপর যে কী করলাম সে আর কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না। মোট কথা পকেটে এখন আর সেটা নেই। পড়েই গেল কোথাও, নাকি কোনো একটা ভালো জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিলাম সে আর কিছুতেই মনে করতে পারছি না। ওই আমার একটা মুশকিল হয়েছে, কিচ্ছু মনে রাখতে পারি না। পড়াশুনা না, কাজের কথা না, আংটির বিষয় না; এক কথায় খেলা ছাড়া আমার কিচ্ছু মনে থাকে না। পেয়ারা গাছের তলায়, খেলার মাঠে ভালো করে খুঁজে এসেছিলাম, তা ছাড়া বইয়ের তাকের পিছনে, আমার সেই খালি কোকোর টিনটাতে, ছাদের আলসের ওই ফাঁকটাতে কোথাও আর দেখতে বাকি রাখিনি। কিন্তু কিছুতেই কিছু নয়।

খাসা আংটিটা ছিল, সোনার একটা গোল মতো, তার মাঝখানে একটা মস্ত সবুজ পাথর, তার দু-পাশে দুটো সাদা পাথর জ্বলজ্বল করছে। আমার খুব ভালো লেগেছিল কিন্তু এখন আর সেকথা ভেবে কী হবে? আরেক বার উঠে খুঁজে এলাম, দিদির পড়ার টেবিলে, বাবার রুমালের দেরাজে, ভাঁড়ার ঘরে, যেসব জায়গায় কখনোই আংটি থাকতে পারে না সেসব জায়গা পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে করে দেখে এলাম। কোথাও নেই।

বাড়ির লোকরা কেউ জানেও না ওটা আমি নিয়েছিলাম। এখন আর বলাও যায় না কাউকে। ওরা চাকরদের সন্দেহ করছে, ঠাকুরকে কিংবা পাতির মাকে, কিংবা ধুনিয়াকে। খুব বকাবকিও করছে, বলছে মাইনে কাটবে, পুলিশে ধরিয়ে দেবে, তাড়িয়ে দেবে। চাকররা খুব ভয় পেয়েছে, ধুনিয়া সিঁড়ির নীচে বসে কাঁদছিল। কী যে করি ভেবে পাচ্ছি না, এত খারাপ লাগছে। কিন্তু আসল কথা এতক্ষণে প্রকাশ করলেও আংটি তো আর ফিরে আসবে না। মাঝখান থেকে আমার পিঠের চামড়াও আস্ত থাকবে না, আমি যে নিজে একটু খোঁজখবর করব তারও জো থাকবে না। ইস, আংটিটাকে সত্যি যদি চোরে নিত, তবে কী ভালোই যে হত! দিদিমার খাটের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবতে চেষ্টা করছিলাম, দুপুরে খাবার পর থেকে কোথায় কোথায় গিয়েছিলাম। ভারি তো একটা ছোট্ট আংটি, আমার ডান হাতের মাঝের আঙুলে ঢুকলই না! তাই নিয়ে এত কাণ্ড! মা বললেন নাকি ওই নিয়ে মাসির শ্বশুরবাড়িতে অশান্তি হতে পারে। যেমনি মাসি ঠিক তেমনি তার শ্বশুরবাড়িটিও। আরে আমার অত বড়ো কলমটা হারিয়ে গেল, তবু কিছু

অশান্তি হল না, বরং মেজোকাকা বলল, বেশ হয়েছে! ঠিক হয়েছে! খুব খুশি হয়েছি! আর ওই একটা খুদে আংটি, সে আবার স্নানের ঘরে ফেলে রাখা হয়েছিল, তাই নিয়ে ক্যায়সা হইচই লাগিয়েছে দেখো না!

আচ্ছা, ভেবেই দেখা যাক-না, কোথায় কোথায় গিয়েছিলাম। খেয়ে উঠে পেয়ারা গাছে; সেখানে দেখেছি, নেই। তারপর খেলার মাঠে, মাছ ধরার জন্য পিঁপড়ের ডিম আনতে; সেখানেও নেই। তারপর ছিপটিপের জন্য চিলছাদের ঘরে, সে জায়গাটাকে তো গোরু-খোঁজা করে ফেলেছি। কীসব পড়ে-টড়ে ভেঙেচুরে, রসের মতো বেরিয়ে, এটাতে-ওটাতে মেখে গিয়ে একাকার কাণ্ড হয়ে আছে। তাই নিয়ে আবার কাল হবে এক চোট। যাই হোক সেখানেও নেই। তাহলে বাকি থাকে পুকুর ধার। আগাগোড়া খুঁজেছি। এক যদি জলে পড়ে গিয়ে থাকে। মাছ খেয়ে ফেলে থাকে। কিন্তু তাই-বা হবে কী করে? শেষ মুহূর্তে তো ছোটোমামা আমার হাত থেকে ওদের ছিপটিপ কেড়ে নিয়ে কান মলে তাড়িয়ে দিয়েছিল। ততক্ষণে বাড়িতে আংটি নিয়ে খোঁজাখুঁজি লেগে গেছে, ওদের কারো মেজাজেরও ঠিক ছিল না। মাছ ধরাও বন্ধ, কাজে লাগাও কানমলা।

তারপর সেখান থেকে বট গাছ তলায়। ইস, কী অদ্ভুত জায়গাটা। চারিদিক থুমথুমে চুপচাপ। দিনের বেলায় ঝিঁঝি পোকা ডাকছে। ঘন পাতার মধ্যে দিয়ে একটু একটু আলো আসছে, বাদুড় চামচিকের সোঁদা গন্ধ। অদ্ভুত জায়গাটা। আর গাছের গোড়ায় সে যে কতকগুলো কী অদ্ভুত জিনিস দেখলাম সে আর কী বলব। সাদা, হলদে, গোলাপি, ভিজে ভিজে মতো, কতকগুলো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া, কতকগুলো ঠিক হট্টিমাটিমটিমের ডিমের মতো। কতকগুলো অবিকল ছাতা প্যাটার্নের। ওগুলোকে তাই ব্যাঙের ছাতা বলে। সাহেবরা ভেজে খায়। কতকগুলো খেলে আবার মরেও যায়। সাংঘাতিক জিনিস। ভীষণ তাড়াতাড়ি বাড়ে, সামনে একটা টুল নিয়ে বসে থাকলে নাকি দেখা যায় একটু একটু করে চোখের সামনে বাড়ছে তো বাড়ছেই।

তারপর বোধ হয় একটু ঘুমিয়ে পড়ে থাকব। মনে হল সেইখানে গিয়ে সত্যি একটা টুলের উপর বসে আছি, আর সামনে একটা গোল ব্যাঙের ছাতা বাড়ছে তো বাড়ছেই। আর আমার টুলটাও সঙ্গে সঙ্গে উঁচু হয়ে উঠছে। টুলটা ভিজে স্যাঁৎসেঁতে কেন? বুঝলাম ওটা টুল নয়, ওটাও একটা ব্যাঙের ছাতা, তাই আমার কালো পেন্টেলুনটাও ভিজে সপ্ সপ্ করছে। কালো পেন্টেলুন আবার কী? আমার পরনে তো খাকি পেন্টেলুন। ঝট করে চোখ থেকে ঘুম ছুটে গেল। খাকি পেন্টেলুনই তো বটে।

এক দৌড়ে উপরে মার শোবার ঘরে খাটের তলা থেকে আমার ছাড়া কাপড়গুলো টেনে বের করলাম। ওই তো ভিজে স্যাঁৎসেঁতে ব্যাঙের ছাতার গন্ধওলা আমার সেই কালো প্যান্টটা। ওইখানেই তো ছেড়ে রেখেছিলাম। না হয় একটু ভুলেই গিয়েছিলাম। বলেইছি তো খেলার কথা ছাড়া কিচ্ছু মনে থাকে না। এই তো প্যান্টের পকেটে আংটিটাও রয়েছে। বলিনি পকেটেই রেখেছিলাম, যাবে কোথায় বাছাধন! যাই, মাসিকে দিয়ে আসি। বলি গিয়ে স্নানের ঘরের তাকেই ছিল। ছিলই তো। সকালে তো সেইখান থেকেই তুলে রেখেছিলাম, আবার কোত্থেকে পাব? মাসি স্নান করে অসাবধান হয়ে আংটি ফেলে গেল। আমি তার পরেই স্নান করতে এসে ভালো মনে করে, ওকে একটা শিক্ষা দেবার জন্য, ওটাকে একটুক্ষণের জন্য পকেটে রেখেছিলাম। অথচ এ-বিষয়ে কিছু খুলে বলতে গেলে আমাকে এরা আস্ত রাখবে না। যাই, বলি গিয়ে স্নানের ঘরে তাকের উপর পেয়েছি।

গুপ্তধন

আমার বন্ধু জগাই কী ভালো! পড়াশুনো সে-রকম একটা ওর আসে না বটে কিন্তু কী চমৎকার মাউথ অর্গান বাজায়। আর টিফিনের সময় আমাকে কতদিন আলুকাবলি খাওয়ায়। তা ছাড়া দুই কান নাচাতে পারে, জিভ দিয়ে নাকের ডগা ছুঁতে পারে। তবে পড়াটড়ায়, সত্যি কথা বলতে কী, বেজায় খারাপ। সেদিন ইতিহাস ক্লাসে সাজাহানের বাবার নামও বলতে পারল না, আবার ছেলের নামও বলতে পারল না। অবিনাশবাবু তো চটে কাঁই, ক্লাসসুদ্ধু ছেলের সামনে ওকে যা নয় তাই বললেন, আর ও ফ্যালফ্যাল করে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তখনই জানি একটা কিছু হয়েছে।

বাড়ি যাবার পথে আমাকে বললে, 'পড়াশুনো ছেড়ে দেব ভাবছি।' আমি বললাম, 'তবে কি বড়ো হয়ে গোরু চরাবি?' জগাই কাষ্ঠহাসি হেসে বললে, 'তোরও যেমন বুদ্ধি। বুঝলি, গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি।' আমি একেবারে থ। বলে কী? আমার তো ধারণা ছিল, যেখানকার যত গুপ্তধন লোকরা সমস্ত এতদিনে খুঁজে বের করেছে।

জগাই বললে, 'আমাদের ওই বাড়িটা কি আজকের মনে করিস না কি? কমসে কম ওর বয়স এক-শো বছর। আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা সিপাহি বিদ্রোহের আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আপিস থেকে বুদ্ধি করে টাকা সরিয়ে ওটাকে আগাগোড়া তৈরি করে ফেলেছিলেন।'

তারপর একটু চুপ করে থেকে জগাই বললে, 'কাল চিলেকোঠার পুরোনো বাক্সপ্যাঁটরা ঘাঁটতে ঘাঁটতে ওর ডায়েরি খুঁজে পেয়েছি। তাতে যেসব কথা লেখা আছে সেসব শুনলে তোর চুল-দাড়ি খাড়া হয়ে উঠবে, দাঁতকপাটি লেগে যাবে। ওরই মধ্যে গুপ্তধনের কথাটাও আছে। সাধে কি আর কোথায় কোন কালে কে কার ছেলে ছিল, কি বাবা ছিল তাই নিয়ে আর মাথা ঘামাই না। আমাকে তো আর আপিসে চাকরি করতে হবে না।'

আরেকটু থেমে জগাই হঠাৎ বললে, 'কিন্তু ভাই, তোকে একটু সাহায্য করতে হবে। আমাদের বাড়িটা জানিসই তো। দিনের বেলায় যদি-বা গুপ্তধনটা খুঁজে বেরও করি, ওইসব বুড়োগুলোর জ্বালায় তাতে আমার আর হাত দিতে হবে না। অমনি আমাকে পড়ার ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরা ভাগবাটরা করে নেবে। দেখ, রাত্রে কাজ হাসিল করতে হবে। আজ খেলার মাঠের পর আসিস একবার, শনিবার আছে, আজ রাতেই কেল্লা ফতে। কিন্তু ভাই জানিসই তো আমার যা ভূতের ভয়, তোকে সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে।' কী করি বলো, আমার বুজম ফ্রেন্ড। তা ছাড়া গুপ্তধন পাওয়া গেলে আমাকেও একটু ভাগ দেবে বললে। গেলাম খেলার মাঠের পর। চাকরদের সিঁড়ি দিয়ে চিলের ছাদে উঠে মোম বাতি জ্বেলে ঠাকুরদার ডায়েরি পড়লাম।

সে কী কাণ্ড। হলদে তুলোট কাগজে সবুজ কালি দিয়ে কীসব হিজিবিজি লেখা, না আছে তার বানানের মাথামুণ্ডু, না যায় তার অর্ধেক বোঝা। কিন্তু গুপ্তধনের কথাটা সম্বন্ধে কোনোই সন্দেহ নেই।

পড়ে মনে হল বুড়োর দু-টি বাবাজীবন অর্থাৎ ঘরজামাই ছিলেন; দু-টিই যেন সাক্ষাৎ রত্ন! সারাদিন খাই খাই আর মখমলের বিছানায় টেনে ঘুম। ওদের গিলেকরা পিরান আর কিংখাবের জুতো আর অম্বুরি তামাক জুগিয়ে জুগিয়ে বুড়ো নাকাল। এদেরই হাত থেকে 'পরম রত্ন' অর্থাৎ কি না ওই গুপ্তধন না লুকিয়ে বুড়োর নিস্তার ছিল না। যেই সুবিধে পাবে অমনি সেটি হাতাবে। অথচ, বাড়িতে পণ্ডিত আসে, কিন্তু পড়াশুনা তাকে তোলা।

ঠাকুরদার ঠাকুরদা লিখছেন, 'চখ্খু হইতে নিদ্রা ঘুচিয়াছে। উহারা শৌখিনতায় ডুবিয়া দিনে দিনে রসাতলে যাইতেছে। উহাদের চিত্তে বড়ো লোভ জাগিয়াছে। সর্বদা পরম রত্নের উপর দৃষ্টি, যেন উহাকে বাগাইতে পারিলে সকল চিন্তা দূর হয়। উহা একবার হস্তগত করিলে নিঃসন্দেহে জুয়া খেলিয়া সর্বস্ব ফুঁকিয়া দিবে।'

তার পরের দুটো পাতায় দুধ না কী যেন পড়ে ধেবড়ে গেছে, কিছু পড়া যাচ্ছে না। কিন্তু তার পরের পাতায় স্পষ্ট করে লেখা 'অগত্যা নিরুপায় হইয়া পরম রত্ন গুম করিয়াছি। গৃহিণীরও ওদিকে দুর্বলতা। মহা অশান্তি করিতেছেন। আমারও ভোলা মন, সেই কারণে গুহ্যস্থানের এই নকশা রাখিতে বাধ্য হইলাম। সুখের বিষয় বাবাজীবনদিগকে মাধব পণ্ডিতের টোলে ভর্তি করিয়া দিতে সখ্খম হইয়াছি।' ব্যস্ ওইখানেই ডায়েরি শেষ। তার পরেই বোধ হয় আনন্দের চোটে বুড়ো মোলো আর গুপ্তধনের কথাও কেউ জানতে পারল না। জগাই বললে, 'এ ডায়েরি বুড়ো চিলছাদের কার্নিসের নীচে গুঁজে রেখেছিল, কাল আমি এটাকে খুঁজে বের করেছি, আজই পরম রত্ন খুঁজে বের করতে হবে। তার পরে পড়াশুনো ছেড়ে দেব। তাই আজ আর মিছিমিছি হোমটাস্কগুলো টুকিনি।'

নকশাটা জলের মতো সহজ। বাবাজীবনদের হাতে পড়লেই সর্বনাশ হয়েছিল। এক নিমেষে পরম রত্ন খুঁজে বের করে জুয়ো খেলে সব ফুঁকে দিত। নকশায় আঁকা ওদের পুকুর ধারের বুড়ো বট গাছ। তার বরাবর উত্তরে বারো হাত একটা রেখা, তার বরাবর পুবে আবার বারো হাত। সেইখানে একটা ক্রস আঁকা। অর্থাৎ কিনা ওইখানেই!

জগাই কোত্থেকে একটা শাবল, একটা মাপবার ফিতে আর একটা টর্চ এনে রেখেছিল। গেলাম পুকুরের পাড়ে। সূর্য ডুবলেই জগাইটার এমনি ভূতের ভয় যে, একটু একটু বিরক্তও লাগছিল। আরে তোরই ঠাকুরদার ঠাকুরদা গুপ্তধন লুকিয়েছে, তোর ভয় করলে চলবে কেন? তা নয়, দূরে শেয়ালের ডাক শুনে ভয় পাচ্ছে, বট গাছের ডাল থেকে শেকড় ঝুলছে দেখে ভয়ে কিচকিচ করে উঠছে, আর টর্চের আলোতে বট গাছের ডালের ছায়া দেখে তো আরেকটু হলেই ভিরমি যাচ্ছিল।

যাই হোক, অনেক কষ্টে মাপজোক করে জায়গাটা পাওয়া গেল! তারপর আমি টর্চ ধরে ওকে বললাম, 'এবার খুঁড়ে দেখ।' ও শাবল দিয়ে ঝুপঝুপ করে আট-দশ কোপ দিয়েই বিরাট এক গর্ত বানিয়ে ফেলল। তারপর ঠং করে একটা শব্দ হতেই আমার খুব ফুর্তি লাগল। কিন্তু জগাইটা দু-হাতে মুখ ঢেকে বলল, 'যদি ডালা খুললেই ওর মধ্যে থেকে কিছু উঠে বসে!'

শেষটা ওকে ঠেলে সরিয়ে, ওর হাতে টর্চ দিয়ে, আমিই একটা এক হাত লম্বা, আধ হাত চওড়া তামার বাক্স টেনে বের করলাম। তার তালাটালা ভেঙে গেছে; ঢাকনিটা খুলে ফেললাম। ভাবলাম হিরে, মণি, মুক্তোর উপর আলো পড়ে নিশ্চয় চোখ ঝলসে যাবে।

টর্চের আলোতে দেখলাম বাক্সের নীচে এক প্যাকেট পুরোনো হাতে-আঁকা তাস পড়ে রয়েছে। তাদের পিঠের উপর বড়ো করে লেখা 'পরম রত্ন।' তীর নীচে ছোট্ট করে লেখা 'প্লেইং কার্ডস্'।

জগাই আস্তে আস্তে টর্চ নামিয়ে রেখে বললে, 'সোমবারের হোম টাস্কগুলো লিখে দিতে ভুলিস না।'

দামুকাকার বিপত্তি

সমস্ত ঘটনাটা দামুকাকার নিজের মুখে শোনা।

অনেক দিন আগের কথা; আমাদের গাঁয়ের দামুকাকা সন্ধ্যে করে হাট থেকে বাড়ি ফিরছে। সেদিন বিক্রি ভালোই হয়েছে, দড়ির ঝোলাটা চাঁচাপোঁছা, ট্যাঁকটিও দিব্যি ভারী। কিন্তু তাই বলে যে দামুকাকার মুখে হাসি ফুটেছিল সেকথা যেন কেউ মনে না করে। ওর মতো খিটখিটে রুক্ষ বদমেজাজি লোক সারা গাঁটা খুঁজে উজাড় করে ফেললেও আরেকটা পাওয়া যেত না। দুনিয়াসুদ্ধ সকলের খুঁত ধরে বেড়ানোর ফলে এখন এমনি দাঁড়িয়েছিল যে এক-আধটা বন্ধুবান্ধব থাকা দূরের কথা, বাড়ির লোকদের মধ্যেও বেশিরভাগের সঙ্গেই কথা বন্ধ, এমনকী ওঘরে ঢুকতে ওদের বিরাটাকার ছাই রঙের হুলো বেড়ালটা পর্যন্ত তৎক্ষণাৎ উঠে ঘর থেকে চলে যেত। দামুকাকা সবই দেখতে পেত কিন্তু বেড়ালটাকে মুখে কিছু বলত না। অন্যদেরও শুধু এইটুকু বলত, 'তোদের ভালোর জন্যই তোদের বলি, তা তোদের যদি এতই মন্দ লাগে, যা খুশি করগে যা, পরে যখন কষ্ট পাবি তখন আমাকে কিছু বলিস না।'

যাই হোক সূর্য অনেকক্ষণ হল ডুবে গেছে, চারিদিক থেকে দিব্যি অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, আকাশে চাঁদ নেই, শুধু তারার আলোতে সব ঝাপসা ঝাপসা দেখা যাচ্ছে। দামুকাকা হন হন করে এগিয়ে চলেছে, এক ক্রোশ পথ, যত শিগগির পার হয়ে যাওয়া যায় ততই ভালো। ভূতপ্রেতে দামুকাকার বিশ্বাস নেই, কিন্তু গোটা দেশজুড়ে লোকগুলো দিন দিন এমনি পাজি বদমায়েশ হয়ে উঠেছে যে পয়সাকড়ি নিয়ে পথে বেরুনোই দায়। বরং বড়ো কুমড়োটাকে বিক্রি করবার জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা না করলেই ছিল ভালো।

প্রায় অর্ধেকটা পথ পেরিয়ে এসেছে, মাথাটা কীরকম যেন একটু ঝিমঝিম করছে, আসবার আগে হাট থেকে একটা পান মুখে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল, তাতেই কাঁচা সুপুরি ছিল হয়তো। তবে বুদ্ধিসুদ্ধি যে সবই দিব্যি চাঙ্গা ছিল, একথা দামুকাকা বার বার বলত।

পথের পাশেই বিরাট বাঁশঝাড়, তারার আলোয় পথের উপর তার ছায়া পড়ে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ঘোর অন্ধকার করে রয়েছে। ওইখানটার কাছাকাছি আসতেই দামুকাকার কেমন গা শিরশির করে উঠল। তবুও হাতের মোটা বাঁশের লাঠিটি বাগিয়ে ধরে সে বড়ো বড়ো পা ফেলে এগিয়ে চলল।

ঠিক বাঁশঝাড়ের সামনাসামনি আসতেই মনে হল সুড়ুৎ করে কালো একটা কী যেন পথের এধার থেকে ওধারে গিয়ে বাঁশঝাড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল। সঙ্গেসঙ্গে দামুকাকার কানে এল

একটা খ্যাঁসখ্যাঁস ফ্যাঁসফ্যাঁস শব্দ, তা সে বাদুড়ের না বেড়ালের না আর কিছুর আওয়াজ ঠিক বোঝা গেল না!

ততক্ষণে দামুকাকার বেশ বুক ঢিপঢিপ শুরু হয়ে গিয়েছিল। গাঁয়ের সকলের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি না করে সঙ্গীসাথি নিয়ে দল বেঁধে পথ চলাই যেন ভালো বলে মনে হচ্ছিল।

বাঁশঝাড়ের অর্ধেকটা পার হয়ে গেছে এমন সময় বাঁশঝাড়ের মধ্যে থেকে কে যেন একটা লম্বা হাত বাড়িয়ে লাঠিগাছটি হাত থেকে কেড়ে নিল। দামুকাকা দারুণ চমকে উঠে ফিরে দাঁড়াতেই তিন-চারটে কালো কালো ডিগডিগে রোগা লোক ওকে ঘিরে ফেলে, কোলপাঁজা করে তুলে নিয়ে বাঁশঝাড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

দামুকাকা যে-সে ছেলে নয়। ওর বাবা ছিল সেকালের নামকরা হাজারি পালোয়ান, লাঠিখেলায় সে হাজার শত্রুকে ঘায়েল করেছিল। মেরে ফেলেনি অবিশ্যি, কারণ তারা ছিল দারুণ বৈষ্ণব, কিন্তু এইসা ঠেঙিয়েছিল যে তারা পালাবার পথ পায়নি। তাদের মধ্যে যে-কটা পেছিয়ে পড়েছিল লম্বা লম্বা করে একটার পর একটা মাটিতে শুইয়ে দিয়ে তবে ছেড়েছিল। কাজেই দামুকাকাও নেহাত হেঁজিপেঁজি নয়। নড়বার-চড়বার ক্ষমতা হারিয়ে সে এমনি ষাঁড়ের মতো চ্যাঁচাতে লাগল যে বাঁশগাছগুলো মড়মড় করে, ঠিক ভেঙে না পড়লেও, তাদের গা থেকে গোছা গোছা পাতা খসে পড়তে লাগল, ফালা ফালা ছাল ছাড়িয়ে আসতে লাগল।

অগত্যা লোকগুলোর মধ্যে একজন একটা কালো গিরগিরে হাত দিয়ে দামুকাকার মুখ চেপে ধরল। মুখ চেপে ধরতেই দামুকাকার নাকে এল কেমন একটা অনেকদিন বন্ধ ঘরের মধ্যে ব্যাঙের ছাতার মতো গন্ধ। ও তক্ষুনি হাত-পা এলিয়ে, দু-চোখ কপালে তুলে মুচ্ছো যাবার জোগাড়।

কিন্তু তারা মুচ্ছো যেতে দিলে তো! অমনি খনখনে গলায় পাঁচ-সাত জন মিলে কানের কাছে, 'ওঁ মোঁড়োলের পোঁ, এঁখন ভিঁর্মি গেঁলে চঁলবে নাঁ! আঁমাদের সভায় আঁগে বিঁচার কঁরে দাও তাঁরপরে যাঁ ইচ্ছে কঁরোগেঁ যাঁও। নঁইলে এঁয়ারা যেঁ খ্যাঁচখেঁচি কঁরে প্রাঁণ অঁতিষ্ঠ কঁরে তুঁললেন।'

তাই শুনে দামুকাকা মুচ্ছো ছেড়ে, উঠে বসে চারিদিকে তাকিয়ে একেবারে থ! বাঁশঝাড়ের মাঝখানটা একদম ফাঁকা, সেখানে একটা ধুনি জ্বলছে, আর তারই চারধারে একদল কুচকুচে কালো মেয়ে আঁচড়া-আঁচড়ি, কামড়াকামড়ি করছে, আর তাদের ঘিরে কাতারে কাতারে কালো কালো ছেলে ঝগড়া থামাবার চেষ্টা করছে আর খুব কানমলা আর চিমটি খাচ্ছে। এক বেচারা মাথায় একটা হাঁসের পালক গুঁজে একটা ঢিপির উপর বসে ছিল। দামুকাকাকে টেনে সে পাশে বসাল। দামুকাকার ততক্ষণে অনেকখানি সাহস ফিরে এসেছে, জিজ্ঞাসা করল, 'তা মশাই তাহলে আমায় কী করতে হবে?'

—'কিঁছু না, শুঁধু এঁই মেঁয়েগুঁলোর মঁধ্যে কেঁ যেঁ কাঁর চেয়ে ভাঁলো দেখতে সেটুকু বঁলে দিন, আঁমরা তো হিঁমশিম খেঁয়ে গেঁলাম। সঁবচেয়ে ভাঁলোর গলায় এঁই সোঁনার মাঁলা পঁরিয়ে দিন আঁর কিছু কঁরতে হবে না।'

দুনিয়ার কোনো মেয়েকে দামুকাকা ভয় পায় না। সামনে এসে হাঁক দিয়ে বলল, 'এই সুন্দরীরা, তোরা এখন খ্যাঁচাখেঁচি রাখ দিকিনি। এইখানে লাইন বেঁধে দাঁড়া, আমি ভালো করে দেখি কে সবচেয়ে ভালো দেখতে।'

অমনি মেয়েগুলো ঝগড়াঝাঁটি ভুলে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে গিয়ে যে-যার চুল ঠিক করতে লেগে গেল, হাত-পা সোজা করতে লাগল।

তাদের রূপ দেখে দামুকাকার তো চক্ষু চড়কগাছ! প্রত্যেকটা সমান হতকুচ্ছিত, কুলোর মতো কান, মুলোর মতো দাঁত, গোল গোল চোখ, আর গিরগিরে রোগা। সবাই হাসি হাসি মুখ করে দামুকাকার দিকে চেয়ে আছে। দামুকাকা একবার তাদের ধারাল দাঁত আর লম্বা লম্বা নখের দিকে তাকিয়ে দেখল। আর অমনি সব ছেলেগুলো করল কী, গতিক বুঝে তফাতে সরে দাঁড়াল, ভাবখানা, এক জনকে মালা দিলেই তো হয়েছে!

কিন্তু দামুকাকা যে সে ছেলেই নয় সে তো বলেছি, এগিয়ে এসে মেয়েগুলোর দিকে ভালো করে নজর করে আরেক বার দেখে নিয়ে বলল

—'সমবেত ভদ্রমহোদয়াগণ, আমি আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করছি যে, আপনারা সকলেই সবচেয়ে সুন্দরী, এক জনও অন্যদের চেয়ে একটুও কম সুন্দরী নন; অতএব সকলেই এই সোনার মালা পাবার যোগ্যা!' বলেই পট করে মালার সুতো ছিঁড়ে ফেলে, প্রত্যেকের হাতে হাতে একটা করে সোনার পুঁতি দিয়ে বাকিগুলো নিজের ট্যাঁকের মধ্যে গুঁজে ফেলল। মেয়েরা সবাই ফার্স্ট প্রাইজ পেয়ে, আর ছেলেরা সমস্ত গোলমাল এমন নির্বিঘ্নে কেটে যাওয়াতে এমনি খুশি হল যে কেউ আর কিছু লক্ষই করল না।

তখন দামুকাকাও গুটি গুটি বাঁশঝাড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়ে, সদর রাস্তা ধরে, 'রাম! রাম!' বলতে বলতে ঊর্ধ্বশ্বাসে গাঁয়ের দিকে ছুটল।

বাড়িতে ততক্ষণে কান্নাকাটি পড়ে গেছে, তারমধ্যে দামুকাকা এসে হাজির হওয়াতে সবাই মহা খুশি। গাঁয়ের লোকও মেলা এসে জড়ো হয়েছিল; দামুকাকা তাদের হাত ধরে বসিয়ে, মুদির কাছ থেকে চিঁড়ে বাতাসা নিয়ে এসে পেট ভরে খাইয়ে দিল। সবাই অবাকও হল যে-রকম, খুশিও হল তেমনি।

এরপরে আর দামুকাকা কখনো রাগ-মাগ করত না। হাট থেকে সবাই দল বেঁধে ফিরত।

গল্প শেষ করে দামুকাকা বলত, ওই কালো লোকগুলোর কথা আর কাউকে বলিনি, বুঝলি। কী জানি গাঁয়ের লোকরা যা ভীতু, হয়তো ভূত মনে করে ভয়-টয় পাবে, ও-পথে আর যাওয়া-আসাই করবে না, তাহলে আবার হাট-ফেরত আরও আধ মাইল পথ হাঁটতে হবে। তা ছাড়া সত্যি তো আর ভূত-ফুত হয় না।'

আমরা বলতাম, 'ও দামুকাকা, ওরা ভূত নয় তো কী?' দামুকাকা বিরক্ত হয়ে বলত, 'তা আর আমি কী জানি! তবে তোদের ইস্কুলে ওদের চাইতেও অনেক খারাপ দেখতে মেয়ে পড়ে এ আমার নিজের চোখে দেখা।'

ভালোবাসা

আজকাল সবই অন্যরকম লাগে। দরজার কড়া নাড়বামাত্র ভিতর থেকে একটা ভারী জিনিস দরজার উপর আর আছড়েও পড়ে না; নখ দিয়ে কেউ দরজায় আঁচড়িয়ে, পালিশ উঠিয়ে, বকুনিও খায় না; ঘরে ঢুকবামাত্র নেচেকুঁদে গায়ের উপর চড়ে একাকারও করে না। মিনু শংকর কেউ কারো দিকে তাকায় না।

শোবার ঘরের মেজেটা অদ্ভুত রকম খালি খালি লাগে; অদ্ভুত চুপচাপও, খচমচ করে কেউ চলে বেড়ায় না, থপথপ করে কানের উপর ল্যাজ আছড়ায় না।

শুধু পিসিমা একটা আরামের নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'আঃ, আপদটা বিদায় হয়ে ঘরদোরগুলো যেন কেমন হালকা হয়ে গেল। এবার একটু নিশ্চিন্দি হয়ে হাত-পা মেলে বসা যাবে। সদাই ভয়ে-ভয়ে থাকতাম ওই বুঝি কন থেকে কীসে মুখ দিয়ে আমায় এসে চাটল! আর তোদেরও বাপু বলিহারি! ঠাকুরদা ত্রিসন্দে জপতপ না সেরে জলস্পর্শ করত না, আর তোদের কি না ওই কুত্তোটার সঙে একপাতে না খেলেই নয়। অস্বীকার করিস নে, স্বচক্ষে দেখেছি টেবিল থেকে সব চুপি-চুপি প্লেট নামানো হচ্ছে!'

মিনু শংকর কেউ অস্বীকার করল না; কোনো কথাই বলল না। নিঃশব্দে যে-যার বই বের করে পড়তে বসে গেল। সাবধানে ঘুরে বসল যাতে আলমারির ওই কোণটাতে যেখানে পুরোনো সবুজ কম্বলখানি পাতা থাকত সেদিকে চোখ না পড়ে।

পিসিমার কথা শুনে বাবা দোরগোড়ায় একবার দাঁড়িয়েছিলেন, এবার তিনিও নিঃশব্দে পাশের ঘরে চলে গেলেন। শুধু মা একটা ছোটো নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'হ্যাঁ, আর তার জন্য কোনো হাঙ্গামা নেই।'

পিসিমা একটু অবাক হয়ে মার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'হাঙ্গামাও নেই, বউ খরচাও নেই। ওর পেছনে তোমরা এ ক-বছরে যা খরচ করেছ তাতে এক-আধটা গরিব ছেলের স্বচ্ছন্দে খাওয়া-পরা চলে যেত। সেজদিদিরাও বলছিল, তোমাদের সবতাতেই বাড়াবাড়ি। কুকুরের জন্য রোজ রোজ দুধ রে, পাঁউরুটি রে, মাংস রে— এ সমস্ত বাড়াবাড়ি।'

মিনু শংকর আস্তে আস্তে বই হাতে করে উঠে গেল। মা বললেন, 'তাহলে জন্তুজানোয়ার না পোষাই উচিত, ঠাকুরঝি।'

'হ্যাঁ, পুষতে হয়, গোরু মোষ পোষ, দুধটা পাবি। নিদেন একটা ছাগলই পোষ, তার দুধের ভারি গুণ, মহাত্মাজি খেতেন। নয়তো বেড়াল পোষ, ইঁদুর মারবে। তা নয়, এ কোথাকার লাট রে বাবা,

ইঁদুর-বাঁদরের দিকে ফিরেও তাকায় না, খালি ওই মিনু শংকরের পিছন পিছন ঘুরঘুর করবে!'

মা বললেন, 'ওরা বাড়ি পৌঁছোবার অনেক আগে থাকতেই কেমন করে জানি টের পেত। অমনি উঠে দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত!' পিসিমা বিরক্ত হয়ে উঠে পড়লেন, 'যাই বাবা, আমারও তো পুজো-আচ্চা আছে।'

সবার পাতে মোটা-মোটা হাড়গুলো সব পড়ে থাকে, ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হয়। সবাই লক্ষ করে, কেউ কোনো কথা বলে না। সন্ধ্যে বেলা বাবা একবার বলে বসলেন, 'আর কুকুর পুষব না। বাঁচেও না বেশিদিন, শুধু হাঙ্গামা বাধায় আর মায়ায় জড়ায়।'

মা বললেন, 'আমিও সেই অবধি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বসে আছি, আর কখনো নয়।' এতক্ষণ পরে মিনু শংকরের কথা ফুটল; দু-জনে জোর গলায় বলে উঠল, 'সত্যি মা, আর কখনো নয়।' শংকর আরও বলল, 'জানো, রাত্রে আমার ঘুম ভেঙে যায়, ভুলে যাই, উঠে পড়ে দেখতে যাই ও ঘুমুচ্ছে কি না।'

পিসিমা ঘরে এসে শেষ ক-টি কথা শুনে বললেন, 'হয়েছে! বলি, তোদের পিসেমশাই স্বর্গে গেলেন, কই তাঁর নিশ্বাস তো একদিনও শুনলাম না, আর তোরা তোদের কুকুরের শোকেই যে হেদিয়ে গেলি! এবার আবার একটিকে এনে দুঃখ ভোলা হবে নাকি?' বাকি চার জনে সমস্বরে বলে উঠল, 'না, না, না, আর কখনো নয়।'

'যাক, তবু যে সুবুদ্ধি হল সেই রক্ষে। পইপই করে বলিনি ওসব জন্তুজানোয়ার ঘরে এনে ঢোকাস নি রে বাবা! যত সব রোগের ডিপো। এই কোলে এসে মাথা রাখছে, এই গায়ের উপর থাবা রাখছে, উঃ, দেখে দেখে আমার গা ঘিনঘিন করে উঠত। তা বাপু কিছু বলবার কি জো ছিল?'

মিনু শংকর একটু অস্বাভাবিকরকম জোরে বলল, 'যাক, এখন তো আর সে নেই, এখন খুশি হয়েছ তো?'

এমনি করে দিন কাটে। পিসিমা ঝিকে জিজ্ঞাসা করেন, 'হ্যাঁ লা, ওটার বাসনকোসনগুলো ফেলে দিয়েছিস তো? নইলে আবার অন্য বাসনের সঙ্গে তুলে রাখলে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে। কোনোই তফাত তো নেই। যত সব আদিখ্যেতা এদের।' ঝিও একগাল হেসে বললে, 'কে জানে, পিসিমা, দিয়েছে হয়তো ফেলে। উঃ, কী বলব পিসিমা, হিঁদুর মেয়ে আমি, আমাকে পর্যন্ত ওই কুত্তোর সেবায় লাগিয়ে দিয়েছিল! হ্যাঁ, সায়েবরাও কুকুর পোষে বটে, কিন্তু তার কাজ করে জমাদার। আর হেথা ঘাটেও আমি, গঙ্গাতেও আমি। তা মা দিয়েছেনও এটা-সেটা আমাকে, মিথ্যে বলব নি। আর আমিও বাসনটা মেজে দিয়েছি, কম্বলটা কেচে দিয়েছি। ওসব আর এখন করতে হবে না, বেঁচেছি।'

এক মাস বাদে ওই ঝিই একটা ছোটো নিশ্বাস ফেলে বলল, 'কি জানেন পিসিমা, মনটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। ওই যে ছাদের কোণে লাঠিগাছটি দেখছেন ওইটে টেনে টেনে নিয়ে বেড়াত। আর সক্কাল বেলায় উঠোনের দুয়োর খুলে ভিতরে যেই-না ঢুকেছি, সে কী ন্যাজ নাড়ার ধুম! সত্যি বলছি মা, আমায় দেখে আর কেউ অমনটি খুশি হয়নি কোনো জন্মে, অথচ কিচ্ছু তো পেত না আমার কাছটিতে। হ্যাঁ, পিসিমা, মা-রা কি আর-একটা আনবে-টানবে না?'

পিসিমা এমন একটি চেলা হারিয়ে বিরক্ত হয়ে বললেন, 'না রে বাবা, আর দরকার নেই। ওরা চার জনেই প্রতিজ্ঞা করেছে আর কক্ষনো নয়,' ঝি আর-একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'কী জানি, ডাক্তারবাবু একদিন বলেছিলেন, যাঁরা কুকুর নিয়ে একবার বাস করেছেন, তাঁরা কুকুর ছাড়া আর

থাকতে পারেন না। বড়ো আদুরে ছিল, পিসিমা, আমাকে দেখলেই এত খুশি হত, ধপাধপ শব্দ করে ন্যাজটা নাড়ত।'

পিসিমা রবিবার সকালে কথাটা একবার নিজেই পেড়ে, সবাইকে যাচিয়ে নিলেন।

'হ্যাঁরে নতুন খবর শুনছিস? ওই পাতির মা কুকুরের সঙ্গে অ্যাদ্দিন শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই চালিয়ে এসেছে, এখন ওর নাকি ভারি মন-কেমন করে। তা আমিও বলে দিয়েছি, বাপু, সে মনই কেমন করুক, কি যাই করুক, আর নয়।'

কেউ কোনো কথা বললে না। আরও ক-দিন কাটল। একদিন ডাক্তারবাবু এসে বললেন, 'কী, কুকুরের শোক কমল? ভালো ভালো কুকুরের ছানা বিক্রি হচ্ছে যে।' মার জন্মদিন আজ, সবাই বড়ো ব্যস্ত। মা সামনে কিশমিশ বেছে যেতে লাগলেন, অম্বলে পায়েসে ঘিভাতে লাগবে। শংকর মিনু পরস্পরের দিকে তাকাল আর বাবা এক বার খবরের কাগজটা নামিয়ে সকলের মুখ ভালো করে দেখে নিয়ে আবার খবরের কাগজের মধ্যে ডুবে গেলেন। শেষে মা বললেন, 'আবার কুকুর?'

সন্ধ্যের মধ্যে রাঁধাবাড়া সেরে, ছেলেমেয়ে ও তাদের বাবার হুকুমমতো মা স্নান করে, নতুন কাপড়খানি পরে বসেছেন। পিসিমা খুশি হয়ে বললেন, 'বাঃ এই বেশ হয়েছে, বউ! আচ্ছা এদের কাউকে দেখছি না যে, সব গেল কোথায়?'

'কী জানি, সব একে একে তো বেরুল। ওই যে ঠাকুরঝি, এক-আধজন এল বোধ হয়।'

প্রথমে এল মিনু আর শংকর কাপড়ে করে কী ঢাকা দিয়ে। মার কোলে ফেলে দিয়ে বললে, 'এই নাও মা, তোমার জন্মদিনের উপহার।'

প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই বাবাও এলেন, 'এই নাও গো, একটা জিনিস আনলাম তোমার জন্যে, ধরো।' বলে আরেকটা কাপড়ে ঢাকা কী কোলে ফেলে দিলেন।

পিসিমা অবাক হয়ে দেখলেন, মার কোলে দু-দুটো মিশকালো কুকুরবাচ্চা, এ ওকে ঠেলাঠেলি করছে, মাড়িয়ে দিচ্ছে, খুদে খুদে ল্যাজ নাড়ছে। লাল লাল জিভ ঝুলছে।

সবাই হেসে ফেলল, 'অ্যাঁ, বাবা! তুমিই বুঝি অন্যটি কিনেছিলে? ওই মেম বলল একজন খুব মোটা ভদ্রলোক কিনে নিয়ে গেছেন।'

বাবা বললেন, 'আমিই তো। এই, তোরা অত পয়সা পেলি কোথায় রে?'

'বা— বা! আমাদের বুঝি জন্মদিনের জমানো টাকা ছিল না? আর বাকিটুকু তো পিসিমাই দিলেন।'

পিসিমা হঠাৎ উঠে পড়ে বললেন, 'যাই, চট করে সন্ধ্যেটা সেরে আসি! বা—বাবাঃ অ্যাদ্দিন তো বাড়ি ছিল না, হয়েছিল একটা গোরস্থান। ওই দেখ, পাতির মার সবতাতেই বাড়াবাড়ি, দু-দুটো বাটি কোত্থেকে আনল বল দেখিনি। ওরে, আমার দুধ থেকেই নিস আজ, কাল থেকে আনালেই হবে।'

পাশের বাড়ি

ইচ্ছে না হয় ব্যাপারটা আগাগোড়া অবিশ্বাস করতে পার, স্বচ্ছন্দে বলতে পার আমি একটা মিথ্যাবাদী ঠগ্ জোচ্চোর। তাতে আমার কিছুই এসে যাবে না, যা যা ঘটেছিল সে আমি এক-শো বার বলব। আসলে আমি নিজেও ভূতে বিশ্বাস করি না।

বুঝলে, মার মেজোমাসিরা হলেন গিয়ে বড়োলোক; বালিগঞ্জে বিরাট বাড়ি, তার চারদিকে গাছপালা, সবুজ ঘাসের লন, পাতা-বাহারের সারি। মস্ত মস্ত শ্বেতপাথর দিয়ে বাঁধানো ঘর, তার সাজসজ্জা দেখে তাক লেগে যায়। তা ছাড়া মেজোমাসিদের ক্যায়সা চাল, হেঁটে কখনো বাড়ির বার হন না, জলটা গড়িয়ে খান না। কিন্তু কী ভালো সব টেনিস খেলেন, পিয়ানো বাজান। আর কী ভালো খাওয়া-দাওয়া ওঁদের বাড়িতে। আসলে সেই লোভেই আজ গিয়েছিলাম, নইলে ওঁদের বাড়িতে এই খাকি হাফপ্যান্ট পরে আমি! রামঃ!

যাই হোক, ওঁদের পাশের বাড়িটার দারুণ দুর্নাম। কেউ সেখানে পঁচিশ-ত্রিশ বছর বাস করেনি, বাগান-টাগান আগাছায় ঢাকা, দেয়ালে অশ্বত্থ গাছ, আস্তাবলে বাদুড়ের আস্তানা। দিনের বেলাতেই সব ঘুপসি অন্ধকার, স্যাঁৎসেঁতে গন্ধ, আর তার উপর সন্ধ্যে বেলায় নাকি দোতলার ভাঙা জানলার ধারে একজন টাকওয়ালা ভীষণ মোটা ভদ্রলোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। তার চেহারা নাকি অবিকল এখনকার মালিকদের ঠাকুরদাদার মতো দেখতে। অথচ সে বুড়ো তো প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে মরে-ঝরে সাবাড়। আর মালিকরা থাকে দিল্লিতে।

নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ ভয়ের চোটে কেউ আর ও-বাড়িমুখো হয় না। আমার কথা অবিশ্যি আলাদা। আমি ভূতটুতে বিশ্বাস করি না। রাতে একা অন্ধকার ছাদে বেড়িয়ে আসি। সত্যি কথা বলতে কী ওই এক বেড়াল ছাড়া আমি কিছুতে ভয় পাই না। শুধু বেড়াল দেখলেই কীরকম গা শিরশির করে।

যাই হোক, বিকেলে সবাই মিলে ওঁদের দক্ষিণের বারান্দায় বেতের চেয়ার-টেবিলে বসে মাংসের শিঙাড়া, মুরগির স্যান্ডউইচ্ ক্ষীরের পান্তুয়া, গোলাপি কেক আরও কত কী যে সাঁটলাম তার হিসেব নেই। কিন্তু তারপরই হল মুশকিল! কোথায় এবার গুটিগুটি বাড়ি যাব, তা নয় গান, বাজনা, নাচ কবিতা বলা শুরু হল। হাঁপিয়ে উঠি আর কী! শেষটায় কি না আমাকে নিয়ে টানাটানি! আমিও কিছুতেই রাজি হব না! মার মেসোমশাই আবার ঠাট্টা করে বললেন, 'ওঃ গান-বাজনা হল গিয়ে মেয়েদের কাজ, আর উনি ভারি লায়েক হয়েছেন! আচ্ছা দেখি তো তুই

কেমন পুরুষ বাচ্চা; যা তো দেখি একলা একলা ওই ভূতের বাড়িতে, তবেই বুঝব কত সাহস!' আর সবাই তাই শুনে হা হা করে হেসেই কুটোপাটি!

শুনলে কথা! রাগে আমার গা জ্বলে গেল, উঠে বললাম, 'কী ভয় দেখাচ্ছ আমাকে? ভূত-ফুত আমি বিশ্বাস করি না। এই দেখো, গেলাম।' বলেই বাগান পার হয়ে টেনে দৌড় মারলাম। এক মিনিটে পাঁচিল টপকে ও বাড়ি!

হাঁটু ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়েই মনে হল ভূত না মানলেও, কাজটা ভালো হয়নি। কীরকম যেন থমথমে চুপচাপ। দুষ্টু লোকদের পক্ষেও ওইখানে লুকিয়ে থাকা কিছুই আশ্চর্য নয়।

যাই হোক টিটকিরি আমার কোনো কালেই সহ্য হয় না, কাজেই না এসে উপায়ও ছিল না। গুটিগুটি এগুলাম। তখনও একেবারে অন্ধকার হয়নি, একটু একটু আলো রয়েছে। দেখলাম দরজা-জানালা ভেঙে ঝুলে রয়েছে, শ্বেতপাথরের সাদা-কালো মেঝে ফুঁড়ে বটগাছ গজিয়েছে, চারদিকে সাংঘাতিক মাকড়সার জাল। তার উপর আবার কীরকম একটা হাওয়া বইতে শুরু করেছে, ভাঙা দরজা-জানলা খটখট করছে, মাকড়সার জাল দুলছে, দোতলা থেকে কী অদ্ভুত সব আওয়াজ আসছে মানুষ হাঁটার মতো, বাক্সপ্যাঁটরা টানাটানি করার মতো। অথচ মস্ত কাঠের সিঁড়িটা ভেঙে নীচে পড়ে আছে, এদিক দিয়ে উপরে উঠবার জো নেই। চাকরদের ঘোরানো সিঁড়িও ভাঙা।

মিথ্যা বলব না, বুকটা একটু ঢিপঢিপ করছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে আবার বাইরে এলাম। এমন সময় দেখি চাকরদের সিঁড়িটার পাশেই একটা গাছ-ছাঁটা কাঁচি হাতে একজন উড়ে মালী। উঃ, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। তাহলে বাড়িটা একদম খালি নয়, জানলায় হয়তো ওকেই দেখা যায়, আঁকড়ে মাকড়ে হয়তো দোতলায় ওঠে।

মালী কাছে এসে হেসে বলল, 'কী খোকাবাবু, ভয় পেলে নাকি? আমার নাম অধিকারী, হেথায় কাজ করি।' আমি বললাম, 'দূর, ভয় পাব কেন? কীসের ভয় পাব?' সে বললে, 'না, ভয়ের চোটে কেউ আজকাল এই পাকে আসেই না, তাই বললাম।' আমি হেসে বললাম, 'যাঃ, আমি ভূত-টুত বিশ্বাস করি না।' অধিকারী লোকটা ভারি ভালো, আমাকে সমস্ত বাড়িটা দেখাল। দুঃখ করতে লাগল কর্তারা আসে না, সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে— ঝাড়লণ্ঠনগুলো ভেঙে পড়ছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মেহগিনি কাঠের আসবাবে সব পোকা ধরেছে, রোদে জলে মস্ত মস্ত ছবিগুলোর রং চটে যাচ্ছে। বাস্তবিক কিছুই আর বাকি নেই দেখলাম। একা একজন মালী আর কত করতে পারে!

বাগানেও সব হিমালয় থেকে-আনা ধুঁতরো ফুলগুলোতে আর ফুল হয় না; কুরচি গাছ মরে গেছে, আম গাছে ঘুন ধরেছে, বলতে বলতে অধিকারী কেঁদে ফেলে আর কী, 'কেউ দেখতেও আসে না।'

শেষে উঠোনের কোণে ওর নিজের ঘরে নিয়ে গেল। পরিষ্কার তকতকে দাওয়ায় বসিয়ে ডাব খাওয়াল, ভাবছিলাম লোকেরা যে কী ভীতুই হয়! কী দেখে যে ভূত দ্যাখে ভেবে হাসিও পাচ্ছিল। তারার আলোয় চারদিক ফুটফুট করছিল। আমার পাশে বসে অধিকারী বলল, 'কেউ এবাড়ি আসে না কেন বলো দিকিনি? সেকালে কত জাঁকজমক ছিল। গাড়িতে ভিড় হয়ে থাকত, গাড়োয়ানরা, সইসরা এখানে বসে ডাব খেত, তামাক খেত, চারদিক গম গম করত।' আমি তাকে বললাম, 'ওরা বলে কি না এ বাড়িতে ভূত আছে, তাই ভয়ের চোটে আসে না। 'শুনে অধিকারী বেজায় চটে গেল, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ভূত? এ বাড়িতে আবার ভূত কোথায়?

নিজের বাড়ির জানলায় বড়োকর্তা নিজে দাঁড়ালেও লোকে ভূতের ভয় পাবে? বললেই হল ভূত! আমি তোমাকে বলছি খোকাবাবু, এক-শো বছর ধরে এ বাড়ির কাজ করছি, এক দিনের জন্যও দেশে যাইনি, কিন্তু কই একবারও তো চোখে ভূত দেখলাম না।' বলে একবার চারদিকে চেয়ে বলল, 'যাই, আমার আবার চাঁদ উঠবার পর আর থাকবার জো নেই।' বলেই, সে তোমরা বিশ্বাস কর আর নাই কর, লোকটা আমার চোখের সামনে মিলিয়ে গেল। দেশলাই কাঠিতে ফুঁ দিলে আগুনটা যেমন মিলিয়ে যায়, ঠিক সেইরকম করে। চারদিকে বাতাস বইতে লাগল, দরজা-জানলা দুলতে লাগল, পুব দিকে চাঁদ উঠতে লাগল, আর আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে ভাঙা সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এই দ্যাখো, এখনও হাঁপাচ্ছি।

ভানুমতীর খেল

গোরুদের ঘরের পিছনের ছোটো ফটকটার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটাকে দেখতে পেলাম। গোয়ালের কোনায় একটা মাটির ঢিবির উপর ঝোপের আড়ালে বসে বসে একটা দেশলাই কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁটছে আর একটু একটু পা দোলাচ্ছে। সারা গায়ে ধুলো মাখা, কাপড়চোপড় ছোঁড়া-ফোঁড়া, খালি পা, এখানে-ওখানে কেটে গেছে।

আমাকে দেখেই বলল, 'আঃ, তোকে দেখে ধড়ে প্রাণ পেলুম রে! এখন বড়ো একঘটি জল দিয়ে প্রাণটাকে বাঁচা দিকিনি বাপ!'

কেউ কোথাও নেই, গুটিগুটি গোরুর ঘরে গিয়ে নামলি ফপলিদের দুধ দোয়াবার বালতি ভরে ঠান্ডা জল নিলাম, ওদের মস্ত পিতলের ঘটির নীচে অনেকখানি দুধ পড়ে ছিল তাও নিলাম।

লোকটা জল দিয়ে হাত-পা-মাথা সব ধুয়ে ফেলল, পকেট থেকে একটা জঘন্য নোংরা রুমাল বের করে ঘামটা মুছে নিয়ে ঢকঢক করে সব দুধটুকু এক নিশ্বাসে খেয়ে ফেলল।

তারপর তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলা নেই কওয়া নেই আমার পায়ের উপর সটাং এক প্রণাম ঠুকে বসল। আমি তো মহা অপ্রস্তুত।

তারপর আমার মুখের দিকে পিটপিট করে তাকিয়ে বললে, 'তা, শাহেন-শার নাকে-চোখে জলের দাগ কেন? কাঁদা-টাঁদা হয়েছে নাকি? আজ্ঞা করেন তো এখুনি সব ব্যাটার মুণ্ডু কেটে নিয়ে আসি।' বলেই খপ করে শূন্য থেকে এই মস্ত এক তলোয়ার ধরে নিয়ে, মাথার চারিদিকে সেটাকে পাঁই পাঁই করে বার-দশেক ঘুরিয়ে, আবার সেটাকে শূন্যে ছুঁড়ে দিল আর সেটাও তখুনি কোথায় মিলিয়ে গেল।

লোকটা আমার দিকে চেয়ে একটু মুচকি হেসে বলল, 'কী স্যার, অবাক হলেন নাকি? চোখ যে গোল গোল হয়ে গেল, ঠোঁট যে ঝুলে পড়ল। তা, কাঁদাকাটির কী হল তা তো বান্দাকে বললেন না?'

আমি নাকটা একটু মুছে নিয়ে বললাম, 'বাড়িসুদ্ধ সব্বাই স্কুলের মাঠে ম্যাজিক দেখতে গেছে। আমার কাল জ্বর হয়েছিল বলে মেজোমামা আমাকে নিয়ে গেলেন না।'

লোকটা ব্যস্ত হয়ে বলল, 'ও কী জাঁহাপনা! আবার চোখে জল কেন? আরে, আপনিও যেমন! কী ম্যাজিক দেখাবে সরু ঠ্যাং-ওয়ালা ওই গুঁপো হতভাগা! ও ব্যাটা জানেই-বা কী, আর পারেই-বা কী। পারে এ-রকম করতে?' বলেই ঘটিটা তুলে নিয়ে তার ভিতর থেকে একটার পর একটা কুড়ি-পঁচিশটা খরগোশ বের করে চারিদিকে ছেড়ে দিল, তারাও ল্যাজ তুলে যেদিকে পারল ছুটে পালাল।

'হ্যাঁ! ব্যাটা জোচ্চুরি করে পাঁচ জন পার্টনারের টাকা হাতিয়ে মস্ত এক তাঁবু ফেঁদে বসলেই কি না ম্যাজিসিয়ান হয়ে গেল! পারে এ-রকম?' বলেই বালতিটাকে একটা ঠেলা মারতেই সেটা আমার চোখের সামনে একটা কচ্ছপ হয়ে গিয়ে গুড়গুড় করে ঝোপটার দিকে এগিয়ে চলল। লোকটাও, 'আরে! যাও কোথায় চাঁদ।' বলে ছুটে গিয়ে আমাদের বালতিটা এনে আমার হাতে দিল। আমি তো থ!

তারপর পা দুটোকে সোজা করে পকেট থেকে একটা দাঁতভাঙা চিরুনি বের করে ঝাঁকড়া কটা-রঙের চুলগুলো আঁচড়াতে লাগল আর মাথা থেকে রাশিরাশি হলদে প্রজাপতি উড়ে যেতে লাগল। তারপর চিরুনিটাকে এক ঝাড়া দিয়ে পকেটে পুরল। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলাম চারিদিক ছোট্ট ছোট্ট সাদা কাগজের ফুলে ছেয়ে গেল।

লোকটা বলল, 'ছিঃ! ওটাকে আপনারা ম্যাজিসিয়ান বলবেন না। ব্যাটা শুঁটকি খায়, ঘুমুলেই নাক ডাকে, আর ভারি পাজি, ছোটোলোক। তবে আজ একহাত নিয়েছি ব্যাটার উপর। আমার কাছে ম্যাজিক শিখে আমাকেই আজকাল তোয়াক্কা করে না। জানেন, ওটার এমনি আস্পদ্দা বেড়েছে যে দরোয়ানদের বলে দিয়েছে আমাকে যেন তাঁবুতে ঢুকতে না দেয়। হুঁ! পিরের সঙ্গে মামদোবাজি! ওর চোদ্দোপুরুষের ভাগ্যি যে ওকে ধুলো ফুঁকে উড়িয়ে দিইনি। ঠিক দিতাম। নেহাত ওর মার মনে কষ্ট হবে কি না তাই ছেড়ে দিলাম। তবে এক্কেবারে ছেড়ে দিইনি স্যার। তাঁবুর বাইরে থেকে এমনি করে একটা তুড়ি মারলাম, আর ওর ট্যাঁকের পয়সা সব এমনি করে আমার ট্যাঁকে চলে এল!' বলেই লোকটা একটা তুড়ি মারল আর অমনি কোত্থেকে সব রাশি রাশি টাকা টুপটাপ করে ওর পায়ের কাছে জড়ো হল। সেগুলিকে গোছা করে কুড়িয়ে আবার পকেটে রেখে, লম্বা একটা সেলাম ঠুকে আমাকে বললে, 'খোদ কর্তা আজ আমাকে দুধে-জলে বাঁচিয়ে দিলেন, নইলে ছুটতে ছুটতে খিদেয় তেষ্টায় প্রাণপাখি এক্ষুনি ভানুমতীর খেল দেখাচ্ছিল আর কী! ব্যাটাচ্ছেলে কী কম বদমাইশ! ওর ট্যাঁকের পয়সা আপনা থেকেই আমার পকেটে চলে এল, আমি মোটে নিইনি, আর হতভাগা আমার পিছনে কি না পুলিশ লাগিয়ে দিল! উঃ! আরেকটু হলেই বুকটা এক্কেবারে ফেটেই যাচ্ছিল, ভাগ্যিস বাঁচিয়ে দিলেন! এখন আপনাকে কী দেওয়া যায় বলুন দিকি? এগুলোর খানিকটা নিয়ে আমাকে কেতাথ করবেন কি?' বলেই শূন্য থেকে একমুঠো টাকা-পয়সা ধরে আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি মাথা নাড়লাম। সে বললে, 'নিন-না স্যার। লজ্জা কীসের! আমি হলফ করে বলছি ওর একটা পয়সাও আমার নিজের নয়, সব ভেলকি! সত্যি নেবেন না স্যার? আমার কিন্তু কোনো ক্ষতি হত না।' আমি বললাম, 'না! পয়সা-কড়ি চাই না।' তখন সে টাকা-পয়সাগুলোকে আবার শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'মনে বড়ো দুঃখ দিলেন, জাঁহাপনা। প্রাণটা বাঁচালেন, এখন আমি যদি উলটে কিছু না করি তবে যে আমি ঋণী থেকে যাব! সেটা কি ভালো হবে? আচ্ছা, নাহয় ফরমাশ করুন শেষ একটা খেল দেখিয়েই যাই। কী হুকুম বলুন।'

আমি বললাম, 'ওই লোকটা নাকি টেবিল-চেয়ার নাচাতে পারে।'

সে হো হো করে হেসে বলল, 'ওঃ, এই! টেবিল-চেয়ার তো যে-সে নাচাতে পারে, সময় থাকলে আপনাকেও শিখিয়ে দিতাম। ও কিছু নয়। তার চেয়ে ঢের ভালো নাচ দেখাচ্ছি আপনাকে।' বলেই তার ময়লা রুমালটাতে তিনটে-চারটে গিঁট দিয়ে নিল, অবাক হয়ে দেখলাম দূর থেকে দেখতে অবিকল একটা ছোট্ট মানুষের মতো হল। তারপর সেটাকে ছুড়ে একটু

তফাতে ফেলতেই সেটা লাফিয়ে উঠে একটা সেলাম ঠুকে, কোমরে হাত দিয়ে ঠ্যাং তুলে এমনি নাচতে শুরু করে দিল যে আমার চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসবার জোগাড়!

তখন লোকটা আমার দিকে ফিরে বলল, 'নাঃ, একা একা বেশি জমাতে পারছে না। আপনার রুমালটিও দেবেন স্যার?'

আমি বললাম, 'না না, রুমাল যদি নাচে তাহলে আমি নাক মুছব কী দিয়ে?'

সে বললে, 'আচ্ছা, আচ্ছা ঠিক আছে স্যার।' বলে নিজের রুমালটিকে আবার হাতে তুলে নিল, আর ওটা ওর হাতের উপরেই নাচতে থাকল। তারপর আস্তে ওর মাথায় একটা টোকা দিতেই দেখি, যে-রুমালটা নাচছিল, তার জায়গায় দুটো রুমাল নাচছে। কতক্ষণ যে ওই নাচ দেখলাম তার ঠিক নেই। শেষে যেন দূরে লোকজেনর সাড়া পেলাম। লোকটা অমনি লাফিয়ে উঠে কুর্নিশ করে বলল, 'চলি জাঁহাপনা। বান্দাকে মনে রাখবেন।' অমনি রুমাল-দুটোও হাত তুলে আমাকে সেলাম করে ওর সঙ্গ নিল। যতক্ষণ দেখা যায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম, ওরা তিন জনে নাচতে নাচতে আমাদের বাড়ির পিছনের রাস্তা ধরে চলে যাচ্ছে। তারপর পথটা যেখানে বেঁকে গেছে, সেইখানে পৌঁছে ওরা একবার ফিরে দাঁড়িয়ে ঘুরে-ফিরে নেচে নিয়ে, হাত নাড়তে নাড়তে মোড় ঘুরে চলে গেল।

দাদারা সন্ধ্যা বেলা কত কী যে বলতে লাগল তার ঠিক নেই। আমার হাসি পাচ্ছিল। একবার শুধু জিজ্ঞাসা করলাম, 'লোকটার মস্ত গোঁফ আছে-না, আর পেন্টেলুনের ঠ্যাং খুব সরু-না?' 'আরে, সত্যি তো রে, তাই। তুই কী করে জানলি? আর জানিস, শেষের খেলাটি অদ্ভুত, স্টেজের উপর টেবিল-চেয়ারগুলো ডুগডুগ করে নাচতে শুরু করে দিল।' আমি বললাম, 'ও আর এমন কী? একটু শিখে নিলেই ও-রকম সবাই পারে। কুর্নিশ করেছিল? সেলাম করেছিল? যাবার সময় হাত নেড়েছিল?' দাদা বলল, 'হ্যাঁ রে, তুই পাগল হলি নাকি!' আমি শুধু পাশ ফিরে একটু মুচকি হাসলাম।

হরিনারায়ণ

ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম নতুন ছেলেটির চেহারার সঙ্গে গিরগিটির চেহারার একেবারে কোনো তফাত নেই। সেই রোগা কাঁকলাশ শরীর, সেই লিকলিকে হাত-পা, সেই বিলবিলে চোখ, সেই হঠাৎ-হঠাৎ ইদিক-উদিক তাকানো। এসে বসল ঠিক আমারই পাশে। নগা-বটুরা তাই দেখে খুব হাসাহাসি করতে লাগল। আর রাগে আমার গা জ্বলে গেল। ঠিক করলাম ছেলেটিকে এইসা কষে দাবড়ে দেব যে আর জন্মে কখনো আমার দিকে এগুবে না।

এমন সময় আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ছেলেটি বলল, 'ভুবনডাঙা, ঠ্যাঙাড়ের মাঠ— এইসব নাম শুনেছিস কখনো? সেখানে শ্যাওড়া গাছের ধারে ধারে, কেয়া বনের আড়ালে আড়ালে মাটি খুঁড়লে কত যে হাড়গোড় পাওয়া যায় তার ঠিক নেই। বুঝলি, সেইখানে আমার বাড়ি।'

তখন ইতিহাস ক্লাস, অবনীবাবু দেখতে ওইরকম ভালো মানুষ হলে কী হবে, আসলে উনি হলেন একটি কেউটে সাপ! বই থেকে চোখ তুলবার আমার সাহস হচ্ছে না, অথচ ছেলেটি কানের কাছে অনর্গল বকে যেতে লাগল, আর সড় সড় করে আমার গায়ের সব লোম খাড়া হয়ে উঠতে লাগল। খুব ঘেঁষে এসে আমার বইয়ের মধ্যে প্রায় মুখ গুঁজে ফেলে বলতে লাগল,

'তুই বন্ধু লোক, তোর কাছে বলতে লজ্জা নেই, আমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে সারা গুষ্টি খুঁজে দেখলে একটাও ভালো লোক পাওয়া যাবে না। সব খুনে, ডাকাত, ঠগ, জোচ্চোর, ধাপ্পাবাজ। কী ভীষণ মিথ্যাবাদী আর কী দারুণ অসৎ যে আমার বাপ-ঠাকুরদারা, সে না দেখলে বিশ্বাস করবি না।'

ঘণ্টা পড়ে গেল, অবনীবাবু চলে গেলেন, অঙ্কের বই হাতে করে অনঙ্গবাবু এলেন। উনি হলেন ওই আরেক জন— অবনীবাবুর মতো, কিন্তু তাঁর চেয়েও সাংঘাতিক। নতুন ছেলেটা ফ্যাল ফ্যাল করে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, আর খচ খচ করে সব অঙ্ক টুকে নিতে লাগল। তখন আর বিশেষ কথা হল না। সেইসব তেলচিটে বাঁশ-বেয়ে-বাঁদর-ওঠার অঙ্ক, ও আমার কখনোই ঠিক হয় না, আজও হল না। কিন্তু ও ব্যাটা দেখলাম সব ঠিক করে কষে রাখল। যাই হোক, তারপর রতন মাস্টারের বাংলা ক্লাস। ঢিলে হাতার লম্বা পাঞ্জাবি পরে কোঁচা দুলিয়ে ঢুলু ঢুলু চোখ করে কোনো দিকে না তাকিয়ে উনি রবিবাবুর কবিতা পড়তে লাগলেন, আর ছেলেটা আবার আমার বইয়ে মুখ গুঁজে বলতে আরম্ভ করল,

'বুঝলি, সারা জীবনে ওঁরা কেউ একটা ভালো কাজ করেননি, লোক ঠেঙিয়ে, লোক ঠকিয়ে, ডাকাতি করে, মদ খেয়ে, জুয়ো খেলে শেষটা প্রত্যেকে বুড়ো বয়সে হরিনাম শুনতে শুনতে

নিজেদের বিছানায় শুয়ে শান্তিতে মারা গেছেন। আর জানিসই তো যারা হরিনাম শুনতে শুনতে মারা যায়, তারা সব্বাই স্বর্গে যায়।'

রতন মাস্টার একটা কবিতা শেষ করে, অন্যমনস্কভাবে চারদিকে এক বার তাকিয়ে, আবার আরেকটা সুর করে পড়তে শুরু করলেন। ছেলেটা বলল, 'কী সুখেই যে সব ছিলেন সেকালে সে আর তোকে কী বলব। বাড়িতে গোরু বালতি বালতি দুধ দিচ্ছে, দই হচ্ছে, ক্ষীর হচ্ছে, ছানা হচ্ছে, সন্দেশ হচ্ছে, ঘি হচ্ছে। গাছভরা আম কাঁঠাল, বাগানভরা তরিতরকারি। একবার সাহস করে যদি ভুবনডাঙা যাস তো এখনও কিছু কিছু দেখবি। সবার হাতে মোটা মোটা সোনার তাগা, গলায় সোনা দিয়ে বাঁধানো রুদ্রাক্ষের মালা। সবাই নিরামিষ খেতেন, ত্রিসন্ধ্যে জপতপ করতেন। আর ঘরে ঘড়া ঘড়া মোহর, সে রাখবার জায়গা হয় না, আদাড়ে-বাদাড়ে কলসিতে পুরে পুঁতে রাখা হত। কতক মনে থাকত, কতক আবার ভুলেও যেতেন। এখন তো যে-কেউ জায়গা বুঝে মাটি খুঁড়ে সেসব বের করে আনতে পারে, না বলবার একটা লোকও নেই।'

আমি এক বার আড় চোখে ছেলেটার দিকে তাকাতেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'আমিই হলাম শেষ বংশধর, আর সব মরে ঝরে চাঁছাপোঁছা হয়ে গেছে।'

তারপর পকেট থেকে মহারানি ভিক্টোরিয়ার চেহারা-দেওয়া এত বড়ো একটা টাকা বের করে বলল, 'ধরে দেখ, কীরকম ভারী, একেবারে খাঁটি রুপো। আজকাল চেয়ে চেয়ে লোকে পায় না। আর ওঁরা এসব যেখানে-সেখানে ফেলে দিতেন। এটা আমি আমাদের পৈতৃক বাড়িতে কুড়িয়ে পেয়েছি! যাস একবার— এমনি কত পড়ে আছে।'

ঘণ্টা পড়ল, রতন মাস্টার পড়েই যাচ্ছেন। নগা-বটুরা মহা হট্টগোল লাগিয়ে দিল, 'স্যার, ঘণ্টা পড়ে গেছে স্যার।' রতন মাস্টারও অন্যমনস্কভাবে বই বন্ধ করে কী যেন ভাবতে ভাবতে চলে গেলেন। জ্ঞানবাবু এলেন।

জ্ঞানবাবুর ইংরিজি ক্লাসেও যে কেউ সাহস করে কথা বলে এই প্রথম দেখলাম। নতুন ছেলেটা আমার বই দিয়ে একটুখানি মুখ আড়াল করে অম্লানবদনে বকে যেতে লাগল। 'দেখ, এই যেসব লোকেরা জেল খাটে, জরিমানা দেয়, তাদের আমি ভারি ঘৃণা করি। অন্যায় করলে আমার একটুও রাগ হয় না, কিন্তু ধরা পড়লে আর আমি তাকে ক্ষমা করি না। বুঝলি, আমার বাবার ঠাকুরদা রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর মুখে একটা পান পুরে লম্বা লম্বা বাঁশের রণপা চড়ে অনায়াসে পঞ্চান্ন মাইল দূরে বর্ধমানে গিয়ে এর-ওর-তার বাড়ি থেকে ঠেঙিয়ে-পিটিয়ে পুঁটলি ভরে সোনাদানা নিয়ে আবার রণপা চেপে ভোরের আগে বাড়ি ফিরে, রণপা দুটোকে পুকুরের জলে ডুবিয়ে রেখে, পুঁটলি তাল গাছের আগায় বেঁধে রেখে, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়তেন। ভোর বেলা পুলিশের লোকে সন্দেহ করে এসে হাজির হত। ঠাকুরদা অঘোরে ঘুমুচ্ছেন, পায়ে এতটুকু কাদা পর্যন্ত লেগে নেই। তারা বার বার মাপ চেয়ে চলে যেত। কিন্তু ঠাকুরদা ভারি ভদ্রলোক ছিলেন, না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়তেন না। ভেবে দেখ, সেই শীতের সকালে মাঠঘাট থেকে ধোঁয়া ধোঁয়া কুয়াশা উঠছে, আমলকী গাছের পাতায় একটু রোদ লেগেছে, আর লাল লাল চোখ করে ঠাকুরদা পুলিশদের ক্ষীর দিয়ে কলা দিয়ে খ্যাসরাপাতি ধানের খই খাওয়াচ্ছেন।'

তারপর টিফিনের ছুটি হল, আমি ঘণ্টা পড়ামাত্র মেজদাদের কাছে গিয়ে তাদের সঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া করলাম। মেজদা বোধ হয় ছেলেটার সম্বন্ধে সাত-সতেরো জিজ্ঞাসা করবে, আমার আর সেসব বলতে ইচ্ছা করছিল না।

টিফিনের পর পণ্ডিতমশায়ের সংস্কৃত ক্লাস, তখন সবাই গল্প করে। ছেলেটা তো আবার আমার পাশে বসেছে, কাছে এসে বলতে আরম্ভ করল,

'দেখ, আমার পূর্বপুরুষরা যেরকম পাষণ্ড ছিলেন, আবার তেমনি দয়ালুও ছিলেন। এদিকে এক কোপে শত্রুর মুণ্ডু উড়িয়ে দিচ্ছেন, আবার ওদিকে লোকের দুঃখের কথা শুনলে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছেন। মহৎ লোকেরা ওইরকমই হন। বুঝলি, একবার ওঁরা সিউড়ির ওদিকে কোথাকার এক মহা অহংকারী জমিদারকে উচিত শিক্ষা দিতে গেছেন। সব কিছু তছনছ করে দিয়ে, তাল তাল লুটে নিয়ে ফিরছেন, এমন সময় ওই জমিদার আর তার সাত ছেলে কেঁদে এসে পায়ে পড়ল, তারা কাজকর্ম কখনো করতে শেখেনি, এখন খাবে কী? তাই শুনে আমার পিতৃপুরুষরা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে, লুটের জিনিস তো ফিরিয়ে দিলেনই, নিজেদের হাত থেকে সোনার তাগা খুলে তাও দিয়ে দিলেন, ঘোড়া চড়ে যাচ্ছিলেন, সেসব ঘোড়া দিয়ে দিলেন। পায়ে হেঁটে বারো মাইল পথ পার হতে বিকেল হয়ে গেল।'

তারপর দুই ঘণ্টা ড্রইং ক্লাস। এবার সকলের যা ফুর্তি, জায়গাটায়গা বদল করে যার যেখানে খুশি বসছে, পেনসিল কাটবার ছুতো করে এদিক-ওদিক ঘুরছে, ভীষণ গল্প করছে। নগা-বটুও অন্য দিনের মতো আমার আশে ঘুরতে লাগল। আমি যেন দেখতেই পাইনি, এমনি করে ছবি আঁকার তোড়জোড় করতে লাগলাম। ছেলেটাও চুপ করে বসে রইল, ছবি-টবি তো মোটে আঁকতে পারে না দেখলাম।

ক্লাসটা একটু ঠান্ডা হয়ে এলে বলল, 'দেখ, ভালো হয়ে আর কে কবে বড়োলোক হয়েছে তুই-ই বল-না? আমার দশা দেখ, কী একটা মোটা জামাকাপড় পরে তোদের সঙ্গে পড়াশুনো করতে এসেছি। ভালো হওয়ার উপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে। কী করি বল, রক্তের মধ্যে আমার ডাকাতি রয়েছে। ভাবছি গরমের ছুটির পর আর স্কুলে আসব না। ভুবনডাঙায় পুরোনো বাড়িটা রয়েছে, মাটি খুঁড়লেই তাল তাল মোহর রয়েছে, খাওয়া-পরার ভাবনা নেই। ভাবছি আস্তে আস্তে পুরোনো ব্যাবসাটা আবার জোড়াতালি দিয়ে নিই। আসবি নাকি আমার সঙ্গে? যা অঙ্ক কষলি দেখলাম, তোর ভবিষ্যৎটা তো একেবারে অন্ধকার।'

কী যে বলব ভেবে পাচ্ছি না। পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে ভুবনডাঙার ঠ্যাঙাড়ের মাঠে ঘুরে বেড়াব, দই ক্ষীর খাব, মুশকিল হল মা-বাবা আর আমার ছোটো বোন ফুটকি যে আবার দুষ্টু লোককে দেখতে পারে না। এখন কী করা যায়? ঠিক এমনি সময় হেডমাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে হেড কেরানিবাবু এসে আমাদের ডেস্কের সামনে দাঁড়ালেন।

কেরানিবাবু একটু লজ্জিত হয়ে বলতে লাগলেন, 'হ্যাঁ, স্যার, এইটিই আমার বড়ো ছেলে হরিনারায়ণ, এর ছোটো আরও তিনটি আছে। নিজের ছেলে বলে বলছি না, কিন্তু এমন সত্যবাদী সৎ ছেলে আজকাল বড়ো-একটা দেখা যায় না।

'আর গুরুজনের প্রতি কী ভক্তি! আমার বৃদ্ধ পিতৃদেবকে তো একরকম পুজো করে। একে স্যার, এই ক্লাসে না নিলে হবে না।'

ছেলেটা ফ্যাল ফ্যাল করে হেডমাস্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না।

ভাবছি কাল কোথায় বসা যায়।